আব্বাসি খিলাফতের ইতিহাস

[প্রথম খণ্ড]

বই	**আব্বাসি খিলাফতের ইতিহাস (১ম খণ্ড)**
লেখক	শাইখ মাহমুদ শাকির
অনুবাদক	জমির মাসরূর
নিরীক্ষণ	মাহদি হাসান
ভাষা-বিন্যাস	কুতুব হিলালী
বানান সমন্বয়	মুহাম্মদ পাবলিকেশন সম্পাদনা পর্ষদ
প্রচ্ছদ	আবুল ফাতাহ মুন্না
অঙ্গসজ্জা	মুহাম্মদ পাবলিকেশন গ্রাফিক্স টিম

আব্বাসি খিলাফতের ইতিহাস

[প্রথম খণ্ড]

শাইখ মাহমুদ শাকির

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

প্রকাশকের কথা

ইতিহাস মহাকালের আয়না। এখানে প্রতিসরিত হয় তার যাবতীয় রঞ্জন, প্রয়োগ ও গতিবিধি। কোথায় সত্য সুন্দর শুভ্র সমুজ্জ্বল লাবণ্য, কোথায় তিলবর্ণের চিত্ররূপময় শোভা, কোথায় দাগ-নিদাগ ও নিখুঁত-নিটোলের প্রতিচ্ছবি—তার সবই দেখতে পাওয়া যায় ওই মহানিক্তির বিম্বিত আয়নায়।

আব্বাসি খিলাফতের অনুষঙ্গে উপর্যুক্ত সারকথাটি ইতিহাসের সমঝদার পাঠক মাত্রই অনুধাবন করতে পারেন। মক্কা-মদিনার পর সিরিয়া থেকে বাগদাদ কীভাবে ইসলামি খিলাফতের কেন্দ্রস্থল হয়ে ওঠে এবং এশিয়া ইউরোপ ও আফ্রিকায় কীভাবে মুসলিম উম্মাহ অপরাজেয় শক্তিতে পরিণতি লাভ করেন, তা সবিস্তার জানতে ইতিহাসের ওই আয়নার দিকে আমাদের তাকাতেই হবে। ইতিহাসের বাঁকবদল কখনোই একরৈখিক হয় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইসলামের গৌরবদীপ্ত বিচিত্র বিকাশের একটি বিশাল সোনালি সময় মহান আব্বাসি খলিফাদের হাত ধরে অতিক্রান্ত হয়েছে।

যারা শত সংশয়ের মাঝেও ছিলেন ঈমানে অবিচল। নিদারুণ নিপীড়নেও ইসলামের রজ্জু ধরে সুসংহত। সমূহ অন্তর্ঘাতমূলক বিভ্রান্তি নিয়েও যারা জিহাদ, শরিয়া, ফিকাহ, হিকমাহ, ফালসাফা, তাসাউফ, তাকওয়া, তালিম-তারবিয়াত, তাহজিব-তামাদ্দুন, কুরবানি ও ইনসাফের সরণিতে সদা ধাবমান।

ইসলাম শুধু আরবের নয়, অনারবও এখানে অচ্যুত নয়। স্বাধীন-পরাধীন, সাদা-কালো, ধনী-নির্ধন, কাছের-দূরের সকলের জন্যই সর্বজনীন এবং পক্ষপাতমুক্ত সভ্য ভদ্র সঙ্গত ও মার্জিত চারিত্র্য নিয়ে ইসলাম আবির্ভূত।

আব্বাসি আমলে ইসলামের এসব অনন্য আলোকিত দিক সবচেয়ে তাৎপর্য নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয়েছে।

প্রিয় পাঠক, ইসলামের জ্ঞানময় ধ্যানময় আমল কিংবা তর্কময় এবং বিস্তর আশা-আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ মহা সম্ভাবনাময় শাসনকালকে যদি কেউ অধ্যয়ন করতে চান, তাহলে তাকে 'আব্বাসি খিলাফতের ইতিহাস' অধ্যয়ন করতে হবে।

গুরুত্বপূর্ণ এ বইটির অনুবাদ করেছেন, জমির মাসরূর ও শাহ মুহাম্মাদ খালিদ। ঐতিহাসিক দিক নিরীক্ষণ করেছেন মাহদি হাসান। ভাষাসম্পাদনা করেছেন আমাদের সময়ের বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্য-সমঝদার মানুষ জনাব কুতুব হিলালী; নিঃসন্দেহে এটি তার অসাধারণ কৃতিত্ব ও দক্ষতার পরিচয় বহন করবে। বানান সমন্বয় করেছেন মাকামে মাহমুদ। এদের সকলের সঙ্গেই পাঠক কমবেশি পূর্বপরিচিত। তাই নতুন করে তাদের সম্পর্কে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তাদের উত্তম বিনিময় দান করুন।

অতএব, বরাবরের মতোই আমি বলব, এ কাজে যা-কিছু ভালো ও কল্যাণকর, তার সবই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর অসুন্দর যত, তা কেবল আমাদের সীমাবদ্ধতা। বইটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আল্লাহ তাআলা জাজায়ে খায়ের দান করুন। আমিন।

—মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
০২ অক্টোবর ২০২২ খ্রি.

অনুবাদকের কথা

আব্বাসি খিলাফতের শাসনকালকে ইসলামের ইতিহাসের কলব তথা আত্মার যুগ বলা হয়। এক দিক থেকে এই খিলাফত যেমন মুসলিমদের ঐতিহ্যের দীপ্ত আলোক হয়ে দাঁড়িয়েছে, অপর দিকে এই সাম্রাজ্যই ইসলামি ইতিহাসের এক ঘনঘোর কলঙ্কিত অধ্যায়ে পর্যবসিত হয়েছে। উমাইয়া শাসকশ্রেণির অদূরদর্শিতা ও খামখেয়ালিপনার কারণে মুসলিম উম্মাহ যখন ঠাঁইহীন-নিরাশ্রয়ের মতো হাবুডুবু খাচ্ছিলেন, আব্বাসি পরিবারের কিছু লোক তখন ঐতিহ্যের মিনার হয়ে আবির্ভূত হন। প্রায় ৫০০ বছরের প্রলম্বিত এই আলোক মিনারটি মাটির সঙ্গে মিশে যায় তাতারিদের এক আকস্মিক বিভীষিকায়।

পুরো সময়খণ্ডটির আদ্যোপান্ত আলোচনা করেছেন মিসরের প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ও তাত্ত্বিক মাহমুদ শাকির রাহিমাহুল্লাহ। আব্বাসি খিলাফত নিয়ে এমনিতেই আলোচনা-পর্যালোচনা বা গবেষণা-কার্যক্রম একেবারেই কম, আবার ইতিহাসের এই পর্বটি নিয়ে আমাদের জানাশোনাও তেমন নেই বললেই চলে। পাঠক মহলে যদিও দুয়েকটি বই সাড়া ফেলেছে বেশ কিন্তু তা ইতিহাসপিপাসু সত্যসন্ধ্যানী পাঠকের সাময়িক ক্ষুধা মেটালেও পরিপূর্ণ স্বাদ ও তৃপ্তি দিতে পারেনি। ক্ষুধা মেটানোর জন্য দুটো স্বাস্থ্যকর খেজুর বা রুটিই যথেষ্ট কিন্তু স্বাদসৃষ্টির জন্য অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে প্রয়োজনীয় মশলাপাতির সঠিক সংমিশ্রণের। আর আব্বাসি খিলাফত অধ্যায়ে সুনিপুণভাবে এ কাজটিই করেছেন বিশিষ্ট লেখক ও নির্মোহ বিশ্লেষক মাহমুদ শাকির রাহিমাহুল্লাহ।

বিশাল আকাশের পরিমণ্ডলে উড়ে বেড়ানো পাখির তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণী দৃষ্টি দিয়ে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন আব্বাসি সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের কাহিনি। প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিকগণ যে বিষয়গুলো এড়িয়ে গেছেন অনায়াসে বা

উদ্দেশ্যে প্রণোদিতভাবে—মাহমুদ শাকির সেগুলো সযত্নে তুলে এনেছেন হৃৎকলমের ছোঁয়ায় কিংবা দেখিয়ে দিয়েছেন চোখে-চোখ আঙুল রেখে। ঐতিহাসিকগণ যেসব ভয়ংকর গলি-ঘুপচি আড়চোখে ভর করে পার হয়ে গেছেন অজানা শঙ্কায়, তিনি মহাসরণির মতো সাঁইসাঁই করে জাদুময় কলম ছুটিয়েছেন সেসব গলি-সড়কে, অকুতোভয় সাহসে ও দ্বিধাহীন চিত্তে।

এই গ্রন্থের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, আব্বাসি খিলাফতের উত্থান-পর্ব ও পতনাংশ দুটির ভূমিকা। শত শত পৃষ্ঠা পড়েও যেসব জট ও রহস্যপ্রশ্ন খোলাসা করা যায় না, মাত্র কয়েকটি পৃষ্ঠা সংবলিত এই ভূমিকা দুটি যেন খুলে দেয় চুলে এঁটে যাওয়া সহস্র গিঁটবিছালি। আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, প্রত্যেক শাসকের জীবনী আলোচনায় সে-সময়কার সামাজিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট কেমন ছিল, তা সবিস্তারে তুলে ধরা। বিষয়টি আলাদা গুরুত্ব রাখার কারণ হচ্ছে, এই তিনটি বিষয় ছাড়া একজন শাসকের আদর্শ-অনাদর্শের সঠিক মানদণ্ডটি বিশ্লেষণ করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। আব্বাসি খিলাফতের পুরোটা জুড়ে ছিল খারিজিদের অসহনীয় আস্ফালন। লেখক প্রতিটি শাসনামলে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা খারিজি সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান নিয়ে আলোচনা করেছেন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে।

মূলত আজকালকার খারিজিদের ভয়াবহতা উপলব্ধি করেই তিনি বিষয়টি বিশ্লেষণে গুরুত্ব দিয়েছেন। সম্মানিত পাঠক-সাধারণের কাছে অনুরোধ থাকবে, লেখকের পক্ষ থেকে সংযুক্ত ভূমিকা দুটি অবশ্যই আগে পড়ে নিবেন।

এর পর আসি অনুবাদের কথায়। অনুবাদ নিয়ে যথাযথ মতামত দিবেন বিজ্ঞ পাঠকগণই, এজন্য অনুবাদের এদিক-সেদিক নিয়ে আলোচনা করে পাঠকের বিরক্তির কারণ হতে চাই না। তবে একটি বই অনুবাদ ও প্রকাশের আগে-পরে কত কথা থাকে, তার দুয়েকটি না বললে অপূর্ণতা থেকে যায় বৈ কি।

প্রকাশক বইটির কাজ হাতে নিয়েছেন সম্ভবত ২০২০ সালের দিকে। দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদ করেছেন, শাহ মুহাম্মাদ খালিদ। পাঠকমহলে এ নামটি বেশ পরিচিত। তার অনুবাদ যথেষ্ট ভালো। দ্বিতীয় খণ্ডের কাজ জমা হওয়ার বেশ কিছুদিন পর আমার কাছে আসে প্রথম খণ্ডের ফাইলটি। প্রকাশক ২০২১ সালের ডিসেম্বরে ফাইলটি আমাকে দেন। মাত্র তিন মাসের মধ্যে কাজটি জমা দেওয়ার কথা। কিন্তু তাকদিরের বিড়ম্বনায় কাজটি শেষ করে ওঠা

কোনোভাবেই সম্ভব হয়ে উঠছিল না। বহু চড়াই-উতরাইয়ের পর ২০২২-এর জুন মাসে কাজটি সমাপ্ত করা সম্ভব হয়। মহান আল্লাহ তাআলার কাছে শোকরিয়া আদায় করি, আলহামদু লিল্লাহ।

এখানে উল্লেখ্য যে, বইয়ের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় লেখক হয়তো বিভিন্ন স্থান ও ফিরকা, সম্প্রদায় ও গোত্রের বিবরণপূর্ণ পরিচয় এড়িয়ে গেছেন। বাংলাভাষী পাঠকের সুবিধার্থে অনুবাদকের পক্ষ হতে সেগুলো টীকা-আকারে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। ফিরকা, গোত্র ও সম্প্রদায়ের তথ্যগুলো নেওয়া হয়েছে আল-মিলাল ওয়ান্নিহাল, আল-বয়ান ম্যাগাজিন ও উইকিপিডিয়া থেকে। প্রাচীন স্থানের পরিচয়গুলোও আমরা পাঠকের সুবিধার্থে চিহ্নিত করে দিয়েছি। এক্ষেত্রে আমাদের মূল নির্ভরতা ছিল মুজামুল বুলদান ও আল-মাওসুআতুল আরাবি। স্থানগুলোর আধুনিক অবস্থানও আমরা নির্ণয় করে দিতে সচেষ্ট থেকেছি। এক্ষেত্রে আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে উইকিপিডিয়ার সহায়তা গ্রহণ করেছি। লেখকের বর্ণনাভঙ্গি কোথাও কোথাও বেশ দুর্বোধ্য—এজন্য আমরা সেসব ক্ষেত্রে হুবহু অনুবাদে না গিয়ে বক্তব্যকে পূর্বাপর করে নিয়েছি। যাতে মূল বিষয় বা বক্তব্যটি অনুধাবন করতে পাঠককে পেরেশানির শিকার হতে না হয়। মোদ্দাকথা, বাক্যের সহজায়ন এবং জটিল ও দুর্বোধ্যতা দূরীকরণের লক্ষ্যে আমরা প্রয়োজনীয় সবটুকু সহায়তার জোগান দিতে চেষ্টা করেছি।

পরিশেষে কথা হলো, ইতিহাস অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটি বিষয়। এতে মৌলিক-চর্চা যেমন ঝুঁকিপূর্ণ, অনুবাদকের হাতুড়ে কলমেও তা কখনো সখনো বেশ নড়বড়ে হয়ে উঠতে পারে। তাই ভুলত্রুটি ও অসঙ্গতি থেকে যাওয়াটা আশ্চর্যের কিছু নয়। সেহেতু কোনো ধরনের অসংলগ্নতা কিংবা অসামঞ্জস্য যদি কোনো সহৃদয় পাঠক খুঁজে পান, গিবতের দুয়ার না খুলে আমাকে সরাসরি অবহিত করবেন; আপনার সমালোচনা ও পর্যালোচনা আমার ও আমাদের সত্যিকার এগিয়ে চলার সোপান হবে ইনশাআল্লাহ। অনুবাদের যতটকু ভালো ও সুন্দর, তা মহামহিম আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে; আর যত ভুলবিচ্যুতি, তার জন্য আমি এবং আমার উদাসীনতা দায়ী। ওমা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ।

—জমির মাসরূর

সূ চি প ত্র

প্রথম খণ্ড

ভূমিকা ১৭

এক. শিয়া ও বাতিনি আন্দোলন ২৮
দুই. প্রশাসনিক কার্যক্রমে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ ৩৮
তিন. গোষ্ঠীতন্ত্র বা গোত্রবাদ ও জাতীয়তাবাদ, ভেতরে বাইরে ৪২
চার. জাগতিক সভ্যতার উৎকর্ষ ৫০
আব্বাসি আন্দোলন ৫৭
আব্বাসি আন্দোলনের গোড়ার কথা ৫৯
আব্বাসি আন্দোলনের সময়কাল ৮৪
আব্বাসি খলিফাগণ ৮৯
আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মদ আস-সাফফা ৮৯
পরিচয় ৮৯
আব্বাসি খিলাফতের সূচনা ও কুফায় গমন ৮৯
আকৃতি ও গড়ন ৯২
মৃত্যু ৯২
বিবাহ ৯২
খিলাফতের দায়িত্বগ্রহণ ৯৩
যুদ্ধ অভিযান ১০০
এক. পরিবার ১০২
দুই. আবু মুসলিম খোরাসানি ১০৩
তিন. গোষ্ঠীগত জাতীয়তাবাদ ১০৪
শাসিত অঞ্চলসমূহ ১০৫
কুফা ১০৫
বসরা ১০৫
মসুল ১০৬
আহওয়াজ ১০৬
ইরান ১০৬

খোরাসান ১০৬
সিন্ধু ১০৭
জাজিরাতুল আরব ১০৭
সিরিয়া ১০৮
মিসর ১১১
আফ্রিকা ১১১
আন্দালুসিয়া ১১১
হিজাজ ১১২
বাহরাইন ও আম্মান ১১২
বিজিত অঞ্চলসমূহ ১১৩
খারিজিদের উৎপাত ১১৪
আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ আল-মানসুর ১১৯
পরিচয় ১১১৯
গঠন ও আকৃতি ১১৯
খিলাফতের মসনদে ১১৯
খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ ১২৬
বিয়ে-শাদি ও সন্তানাদি ১৪৭
দৈনন্দিন রুটিন ১৪৭
বিজিত অঞ্চলসমূহ ১৪৮
মালাতিয়া বিজয় ১৪৮
গুচ্ছ অভিযান ১৪৯
তাবারিস্তান আক্রমণ ১৪৯
দাইলাম বিজয় ১৫০
তিবিলিসি পুনরুদ্ধার ১৫০
কাশ্মীর বিজয় ১৫১
শাসিত অঞ্চলসমূহ ১৫২
শাম ১৫২
কুফা ১৫২
বসরা ১৫৩
জাজিরাতুল আরব ১৫৩
মসুল ১৫৩
খোরাসান ১৫৪
সিন্ধু ১৫৫
হিজাজ ১৫৫
মিসর ১৫৫

আফ্রিকা ১৫৬
আন্দালুসিয়া ১৫৭
খারিজি উৎপাত ১৫৯
আমর ইবনু হাফস অধ্যায় ১৬১
ইয়াজিদ ইবনু হাতিম অধ্যায় ১৬২
মুহাম্মদ ইবনু আবদিল্লাহ আল-মাহদি ১৬৩
জন্ম ও পরিচয় ১৬৩
খিলাফতের মসনদে ১৬৩
বদান্যতা ও চারিত্রিক সুষমা ১৬৪
রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমসমূহ ১৬৫
বিয়ে-শাদি ১৬৬
মৃত্যু ১৬৬
যুদ্ধাভিযান ও বিজিত এলাকা ১৬৭
আন্দোলন-বিদ্রোহ ১৬৮
খারিজি উৎপাত ১৭০
আন্দালুসিয়া ১৭১
মুসা ইবনু মুহাম্মদ আল-হাদি ১৭৩
আন্দোলন-বিদ্রোহ ১৭৬
হারুন ইবনু মুহাম্মদ আর-রশিদ ১৭৮
ইন্তিকাল ১৮১
বিয়ে-শাদি ও সন্তানাদি ১৮১
আন্দোলন-বিদ্রোহ ১৮৫
আবারও খারিজি উৎপাত ১৮৯
রোমের যুদ্ধ ১৯০
বিচ্ছিন্ন সাম্রাজ্যসমূহ ১৯৪
তিয়ারেতে রুস্তমি সাম্রাজ্য ১৯৫
সিজিলমাসায় বনু মিদরারের সাম্রাজ্য ১৯৬
আন্দালুসিয়ায় উমাইয়া শাসন ১৯৬
মাগরিব অঞ্চলে ইদরিসিয়া সাম্রাজ্য ১৯৮
আগলাবিয়া সাম্রাজ্য ১৯৮
আল-আমিন মুহাম্মদ ইবনু হারুন ২০১
জন্ম ২০১
খিলাফতের পথে ২০১
দৈহিক গড়ন ২০৯
খিলাফতের মসনদে ২০৯

ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই ২১০
রোম অভিযান ২১৩
আন্দোলন-বিদ্রোহ ২১৪
বিচ্ছিন্ন সাম্রাজ্যসমূহ ২১৫
আল-মামুন আবদুল্লাহ ইবনু হারুন ২১৬
জন্ম ও পরিচয় ২১৬
গঠনাকৃতি ২১৬
খিলাফতের মসনদে ২১৮
বাগদাদের দিনলিপি ২১৮
গভর্নর ও শাসক নিয়োগ ২১৮
আন্দোলন-বিদ্রোহ ২২০
বিজিত অঞ্চলসমূহ ২২৮
বিচ্ছিন্ন সাম্রাজ্যসমূহ ২৩১
এক. রুস্তমিয়া সাম্রাজ্য ২৩১
দুই. বনু মিদরার সাম্রাজ্য ২৩১
তিন. আন্দালুসিয়ায় উমাইয়া সাম্রাজ্য ২৩২
চার. ইদরিসিয়া সাম্রাজ্য ২৩৩
পাঁচ. আগলাবিয়া সাম্রাজ্য ২৩৩
মুহাম্মদ ইবনু হারুন আল-মুতাসিম ২৩৬
আন্দোলন-বিদ্রোহ ২৩৯
রোমকদের বিশৃঙখলা ২৪২
বিচ্ছিন্ন সাম্রাজ্যসমূহ ২৪৩
এক. রুস্তমিয়া সাম্রাজ্য ২৪৩
দুই. বনু মিদরার ২৪৩
তিন. আন্দালুসিয়া ২৪৪
চার. ইদরিসিয়া সাম্রাজ্য ২৪৪
পাঁচ. আগলাবিয়া সাম্রাজ্য ২৪৪
আল-ওয়াসিক বিল্লাহ হারুন ইবনে মুহাম্মদ আল-মুতাসিম ২৪৫
আল-মুতাওক্কিল বিল্লাহ জাফর ইবনু মুহাম্মদ আল-মুতাসিম ২৪৯
আন্দোলন-বিদ্রোহ ২৫১
রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ২৫৩

আব্বাসি খিলাফতের ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

ভূমিকা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর। দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সরদারে রাসুল হজরত মুহাম্মদ ইবনু আবদিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর; যিনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি। আরও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর আহলে ইয়াল তথা পরিবারবর্গ, সাহাবায়ে কিরাম এবং যারা কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাবেন, তাদের ওপর।

শিয়াদের আচরণ সবসময় ধোঁয়াশাপূর্ণ, কুটিল ও রহস্যময়। উমাইয়া খিলাফতের অধঃপতন তথা বিনাশের লক্ষ্যে তারা মাঠে নেমেছিল আব্বাসিদের সঙ্গে জোট বেঁধে। চেয়েছিল বনু উমাইয়াকে মুসলিম বিশ্বের একটি কলঙ্ক ও অভিশাপ হিসেবে তুলে ধরতে। পরবর্তীকালে নিজেদের নগ্ন স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে আব্বাসিদের পিছু নিতেও ছাড়েনি। বনু উমাইয়ার মতো বনু আব্বাসের ইতিহাসকেও তারা বিকৃত করতে কম চেষ্টা করেনি। এমনিতেই তারা তাদের কার্যকম শুরু করেছিল উমাইয়াদের সঙ্গে রাজনৈতিক শত্রুতার মধ্য দিয়ে। এর সঙ্গে দুর্ভাগ্যজনকভাবে ইতিহাসের আরেকটি অধ্যায় যুক্ত হয়েছিল, তা হলো, ইতিহাস রচনাকালীন বিচারক কিংবা শাসকশ্রেণির প্রায় সকলেই ছিলেন শিয়াঘেঁষা।

বনু উমাইয়ার অব্যবহিত পরে আব্বাসিদের সঙ্গে তাদের শত্রুতার অন্যতম কারণ হলো—মূলত উমাইয়া খিলাফত-বিরোধী আন্দোলনের শুরু হয়েছিল আহলে বাইতের নাম ধরে। 'আহলে বাইত'-এর এই ভিত্তিটি না হলে তখন বনু উমাইয়ার বিরুদ্ধে কোমর সোজা করে দাঁড়ানোর কোনো উপায়ই ছিল না। সেই আহলে বাইতের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে গড়ে ওঠা বিশাল এক নতুন সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিকারী হয়ে বসে বনু আব্বাস। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদ-পদবিতে আবু তালিবের সন্তানরা একপ্রকার অচ্ছুত হয়ে পড়ে। এতেই ফুঁসে ওঠে আহলে বাইতের এই অংশটি। খিলাফতের মূল-মসনদে নিজেদেরকে দমিত ও দলিতরূপে দেখতে পেয়ে তারা ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়ে। নেমে পড়ে নতুন লড়াইয়ে নতুন কৌশলে ও সম্পূর্ণ নতুন এক যুদ্ধে। বিদ্রোহ ও অস্ত্রের ঝনঝনানির

পাশাপাশি নবসৃষ্ট এই শত্রুকে দমন করতে তারা আশ্রয় নেয় ইতিহাস বিকৃতির। ন্যায় আন্দোলনের পাশাপাশি লেপন করতে থাকে বিরোধী শিবিরে অপবাদের অনপনেয় কালি।

সে সময় 'আহলে বাইত'—এই পরিভাষাটিই স্বার্থান্বেষীদের জন্য একটি মোক্ষম অস্ত্রে পরিণত হয়েছিল। নিজেদের স্বার্থ-হাসিলের পাশাপাশি বিরোধী পক্ষকে সহজে ঘায়েল করার জন্য তখন 'আহলে বাইত' শব্দটি অহরহ ব্যবহৃত হতো। এক্ষেত্রে স্বার্থের ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহারের শিকার হয়েছেন আবু তালিবের সন্তানেরা। আহলে বাইতকে সামনে রেখে স্বার্থান্বেষী লোকজন নিজেদের পক্ষে বেশ আনুকূল্য জোগাড় করে নিতে সক্ষম হয়। আত্মপ্রকাশ করে 'শিয়া' নামধারী একটি দল। তবে একসময় এই শিয়া মতবাদ স্রেফ একটি দল বা একটি আন্দোলনে সীমিত থাকেনি। এর ভেতরেই শেকড়ের মতো গজিয়ে উঠতে থাকে আরও অসংখ্য দল-উপদল। এদের কারও গায়ে গতরে ইসলামের গন্ধ পাওয়া গেলেও অধিকাংশই চলে গিয়েছিল ইসলাম থেকে যোজন যোজন দূরে। এই ডামাডোলের ভেতর দক্ষিণ ইরাকে আত্মপ্রকাশ করে জানজি[১] ফিতনা। তাদের ভেতর থেকে আবার বের হয়ে আসে কারামিতা,[২] নুসাইরিয়া,[৩] ইসমাইলিয়া,[৪] ও

---

[১] হিজরি তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে আব্বাসি খিলাফতের বিরুদ্ধে জেগে উঠে এই জানজি বিদ্রোহ। ৮৬৯-৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ছিল এই বিদ্রোহের স্থিতি। এই বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল ইরাকের বসরা শহরের কাছে, যা আব্বাসি শাসনামলে ইসলামি খিলাফতের অন্যতম কেন্দ্র ছিল। পূর্ব আফ্রিকা থেকে আগত এই জানজিরা (নিগ্রোরা) শ্রমবহুল কৃষিকাজে নিযুক্ত হতো এবং বিভিন্ন ফসল, যেমন আখ আহরণে কাজ করত। এদের বসবাস ছিল বিশেষ করে দক্ষিণ ইরাকে টাইগ্রিস এবং ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকা অন্তর্ভুক্ত কৃষি অঞ্চলে। সপ্তম এবং নবম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে যতগুলো বিপ্লব ঘটেছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক ছিল জানজি বিদ্রোহ। যা আজও ইতিহাসের পাতায় জানজি (নিগ্রো) বিপ্লব নামে পরিচিত।

এই ফিতনার নেতা ছিল একজন পারসিক। যে নিজেকে আলি ইবনু মুহাম্মদ ইবনু আহমদ ইবনু আলি ইবনু ঈসা ইবনু জায়েদ ইবনু আলি ইবনু হুসাইন ইবনু আলি ইবনু আবি তালিব বলে পরিচয় দিত। নামকরা কবি ও পণ্ডিত ব্যক্তি। যে সামাররাতে ব্যাকরণ, ক্যালিগ্রাফি এবং জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয় চর্চা করত। সে ছিল আব্বাসি খলিফা আল-মুনতাসির বিল্লাহর ঘনিষ্ঠদের একজন। মুনতাসিরের মৃত্যুর পর আলি ইবনু মুহাম্মদ বাগদাদ ছেড়ে সামারার উদ্দেশ্যে এবং সেখান থেকে বাহরাইনে চলে যায়, যেখানে সে তুর্কি সৈন্যদের নেতৃত্বে আব্বাসিয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিপ্লবের ডাক দেয়। এই আন্দোলন যদিও নিগ্রো বা জানজি বিপ্লব নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। কিন্তু বাস্তব কথা হলো, এটি নিগ্রোদের মধ্যে সীমাবদ্ধ কোনো আন্দোলন ছিল না। এতে নিগ্রোদের স্বার্থসিদ্ধিও ছিল না তেমন। কারণ এই আন্দোলনের অধিকাংশ নেতা ছিল আরবি, আলাবি। যেমন আলি ইবনু আবান আল-মুহাল্লাবি, সুলাইমান ইবনু মুসা শারাওয়ানি, সুলাইমান ইবনু জামে, আহমাদ ইবনু মাহদি জুব্বায়ি, ইয়াহিয়া ইবনু মুহাম্মদ বাহরানি ও মুহাম্মদ ইবনু সামআন প্রমুখ।—অনুবাদক।

[২] খতিবে বাগদাদি রহিমাহুল্লাহ বলেন—হামদান কারমাতের দিকে নিসবত করে কারামিতা নামটি গ্রহণ করা হয়েছে। তার ঘন লাইনে লেখা বা ঘন পায়ে হাঁটার কারণে তাকে এই উপাধি দেওয়া হয়েছিল। সে ছিল মূলত কুফার গ্রামাঞ্চলের এক কৃষক। পরবর্তীকালে তাকে ইরাকে ইসমাইলিয়াদের নেতা হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। কারামিতারা ইসমাইলি শিয়াদের একটি উপদল। এরা ছিল শিয়াদের সবচেয়ে নৃশংস ও দুর্ধর্ষ গ্রুপ। বাহরাইন ও ইয়েমেনে এরা নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। বাহরাইনের কারামিতারা একবার হজের মৌসুমে মক্কা আক্রমণ করে সাধারণ জনগণ ও হাজিদের মধ্য হতে প্রায় ত্রিশ হাজার লোককে হত্যা করে। নারী ও শিশুদের ক্রীতদাস বানিয়ে

হামদানি[৫] নামের বিচিত্র উপদল। এরপর প্রতিষ্ঠিত হয় উবাইদি সাম্রাজ্য। সৃষ্টি হয় দ্রুজি ফিতনা।[৬] এদের মধ্য সবচেয়ে প্রভাবশালী ও ভয়ংকর দলটি হচ্ছে ইমামিয়া।[৭] তারা

ধরে নিয়ে যায়। কাবার দরজা খুলে ফেলে। ছিন্নভিন্ন করে ফেলে কাবার গিলাফ। হাজরে আসওয়াদ লুট করে নিয়ে যায় তাদের দেশে। লোকজনের ঘরবাড়িতেও তারা লুটতরাজ চালায়। দীর্ঘ ২২ বছর লুকিয়ে রেখে একদিন সেটি আগের জায়গায় স্থাপন করে রেখে যায়। সেখানে একটি চিরকুটে তারা লিখে রেখে যায়— যার আদেশে এটি নিয়ে গিয়েছিলাম, তার আদেশেই আবার রেখে গেলাম। ইবনু খালদুন রহিমাহুল্লাহ বলেন—ইহসায় বনু সালাবের নেতা আসগার আবুল হাসান সালাবি কারামিতাদের মূলোৎপাটন করতে আস্মানের নেতা বনু মুকরিমের সঙ্গে সন্ধি করে। বনু মুকরিম আস্মান দখল করে নেয় আর আসগার দখল করে ইহসা। সেখানে তারা আব্বাসি খলিফার পক্ষে ভাষণ দেওয়া শুরু করে। তাদের হাত ধরেই কারামিতাদের পতন শুরু হয়। তাদের পতনের পেছনে অবশ্য আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল।-অনুবাদক

[৩] কট্টর বাতিনী এক ফিরকার নাম নুসাইরিয়া। হিজরি তৃতীয় শতাব্দীতে শিয়া ইমামামিয়া দল থেকে তাদের উৎপত্তি। উত্তর সিরিয়ায় 'জাবলুল আলাবি' নামে যে পর্বত আছে, সেখানেই নুসাইরি সম্প্রদায়ের লোকেরা বসবাস করত। এই সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ঐতিহাসিক নাম নুসাইরিয়া হলেও ইরান, তুর্কিস্তান ও কুর্দিস্তানে এদের স্থানীয়ভাবেও কিছু নাম প্রচলিত রয়েছে। যেমন পশ্চিম আনাতোলিয়ায় এরা 'তাখতাজিয়া' বা 'হাম্তাবুন' নামে খ্যাত। ইরান, তুর্কিস্তান ও কুর্দিস্তানে এরা 'আল আলি-ইলাহিয়া' নামে পরিচিত। নুসাইরিয়া সম্প্রদায়ের সূচনা মুহাম্মদ ইবনু নুসাইর নুমাইরি থেকে । তার উপনাম আবু শুআইব। সে ছিল শিয়া ইমামিয়া মতবাদের অনুসারী। বাড়ি ছিল পারস্যে। একসময় মাহদিয়াত নিয়ে শিয়াদের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি হয়। তার দাবি ছিল সে নাকি প্রতীক্ষিত মাহদির উকিল বা প্রতিনিধি। তার এই দাবি শিয়া ইমামিয়ারা হেসে উড়িয়ে দেয়। তখন সে নিজ অনুচরদেরকে নিয়ে নিজের মত করে একটি দল বা মতবাদ প্রতিষ্ঠা করে। ২৬০ হিজরিতে তার ইন্তিকাল হয়। সে প্রথমে মাহদির প্রতিনিধি দাবি করলেও পরবর্তীকালে নবুওয়ত, আলির রাদিয়াল্লাহু আনহুর উলুহিয়াত (প্রভূত্ব) দাবি করে বসে। পুনর্জন্মের ও সমকামিতা হালাল হওয়া ইত্যাদি মতবাদও সে প্রচার করতে শুরু করে।-অনুবাদক

[৪] ইসমাইলিয়া হলো শিয়াদের একটি শাখা বা উপদল। ইসমাইলিরা ইসমাইল ইবনু জাফরকে তার পিতা জাফর সাদিকের নিযুক্ত আধ্যাত্মিক ইমাম হিসেবে গ্রহণ করে। তার নামেই দলটির ইসমাইলি নামে প্রসিদ্ধ হয়ে যায়। এর মাধ্যমে তারা তাদের ইসনা আশারিয়াদের থেকে নিজেদেরকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে। যারা ইসমাইলের ছোট ভাই মুসা আল-কাজিমকে পরবর্তীকালে ইমাম হিসেবে গ্রহণ করেছিল। এরা পরবর্তী সময় বহু দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এদের সর্ববৃহৎ উপদল হলো নিজারি ইসমাইলি এবং তারা চতুর্থ আগা খানকে ৪৯শ বংশানুক্রমিক ইমাম হিসেবে গণ্য করে থাকে। অন্যদিকে বাকি দলগুলো তৈয়বি ইসমাইলি হিসেবে পরিচিত। বৃহত্তম ইসমাইলি জনগোষ্ঠী বসবাস করে বাদাখশানে। তবে মধ্য এশিয়া, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ইয়েমেন, লেবানন, মালয়েশিয়া, সিরিয়া, ইরান, সৌদি আরব, ভারত, জর্দান, ইরাক, পূর্ব আফ্রিকা, অ্যাঙ্গোলা, বাংলাদেশ ও দক্ষিণ আফ্রিকায় ইসমাইলিদের বসবাস রয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তারা ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ত্রিনিদাদ ও টোবাগোতেও বসবাস করতে শুরু করেছে। ইসমাইলিরা কালিমায়ে শাহাদতকে ইসলামের মূল স্তম্ভ মনে করে না। তাদের কাছে ইসলামের মূল স্তম্ভ সাতটি। **এক.** ওয়ালি বা অভিভাবকত্ব, **দুই.** তাহরা বা শুদ্ধতা, **তিন.** নামাজ, **চার.** জাকাত বা দান, **পাঁচ.** সিয়াম বা রোজা, **ছয়.** হজ বা বিশেষ তীর্থযাত্রা, **সাত.** জিহাদ বা সংগ্রাম।-অনুবাদক

[৫] হামদানি বিপ্লবের মূল ছিল হামদান ইবনু হামদুন ইবনু হারিস তাগলিবি। আল-জাজিরা বা আরব উপদ্বীপের একজন তাগলিবি আরব সর্দার এবং হামদানি সাম্রাজ্যের অধিপতি। এলাকার অন্যান্য আরব সর্দারদের সঙ্গে সে ৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে জাজিরার ওপর আব্বাসিদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করে এবং খারিজি বিদ্রোহে যোগ দেয়। সে শেষ পর্যন্ত ৮৯৫ সালে খলিফা আল-মুতাদিদ কর্তৃক পরাজিত ও বন্দি হয় কিন্তু তার পুত্র হুসাইনের প্রতি খলিফার সুদৃষ্টির পুরস্কার হিসেবে সে মুক্তি লাভ করে।-অনুবাদক

[৬] দ্রুজ বাতিনিদের একটি ফিরকা, অন্যদের চেয়ে এরা অনেকটা ভিন্ন। বর্তমান সিরিয়া ও লেবাননে তাদের বেশির ভাগ লোকের বসবাস। তারা ফাতেমি শাসক খলিফা হাকিম বি আমরিল্লাহর উলুহিয়াতে (প্রভুত্ব) বিশ্বাস

নতুন নতুন চিন্তাভাবনা ও খামখেয়ালিপূর্ণ বিকৃত মতাদর্শ আবিষ্কার করতে থাকে। যেগুলো তারা প্রচার করতে শুরু করে পূর্ববর্তী আহলে বাইতের নামে; যাদের সঙ্গে সেইসব মহান মানুষের ন্যূনতম কোনো সংস্রবই ছিল না। কিন্তু এরই মধ্যে বহু বিখ্যাত ঐতিহাসিক এই ধূর্ত শিয়া জনগোষ্ঠীর প্রচার-প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয়ে লিখে ফেলেছেন শত শত পৃষ্ঠা। গুলিয়ে ফেলেছেন শুদ্ধাশুদ্ধির ঐশী ব্যবধান। ঐতিহাসিকদের কলমের খোঁচায় সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত হয়েছেন জাইনুল আবিদিন ইবনু হুসাইন; তার ছেলে জায়েদ ও নাতি জাফর সাদিক।

চতুর্থ শতাব্দীর শুরু থেকেই ইসলামি ভূখণ্ডের অনেকাংশের নিয়ন্ত্রণ চলে যায় এই শিয়াদের হাতে। তবে বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ার দরুন তারা জোরালোভাবে তেমন কোনো কাজ আঞ্জাম দিতে সক্ষম হচ্ছিল না। তাদের না ছিল কোনো মতাদর্শিক ঐক্য, না সুনির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বা পরিকল্পনা। প্রত্যেক দল তাদের নিজস্ব অঞ্চলগুলো শাসন করত নিজেদের মতো করে। এই অবস্থা থেকেই বুঝা যায়, তারা আসলেই ছিল কপটাচারী, স্বার্থান্বেষী ও ভুঁইফোঁড় জনগোষ্ঠী। স্রেফ ক্ষমতার প্রয়োজনে যারা 'শিয়া' নাম ধারণ করেছিল। প্রকৃত অর্থে আহলে বাইতের জিগির তুলে মসনদে আসীন হওয়াটাই ছিল তাদের মূল মকসুদ। কারামিতারা শাসন করত গোটা জাজিরাতুল আরব; সেখান থেকে তারা সুদূর শাম পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তৃত করে নেয়। কড়া নাড়তে থাকে মিসরের দুয়ারেও। ফাতিমিদের সাম্রাজ্য ছিল উত্তর আফ্রিকায়। পরবর্তীকালে মিসর দখল করে সেখানে গড়ে তোলে মূল ঘাঁটি। শামের উত্তরাঞ্চল শাসিত হতো হামদানিদের হাতে। বুওয়াইহিরা চেপে ধরেছিল আব্বাসি সাম্রাজ্যের কণ্ঠনালি। তারা নিজেদেরকে শিয়া দাবি করলেও তাদের সাম্রাজ্য ছিল শতধা বিচ্ছিন্ন। নিজেদের মধ্যেই লেগে থাকত দীর্ঘসময়জুড়ে রক্তক্ষয়ী সংঘাত-সংঘর্ষ। ফাতিমিরা মুখোমুখি হয় কারামিতাদের। তাদেরকে মিসরের ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িত করে দেয়। বুওয়াইহি ও হামদানিদের লড়াইয়ের কথা তো ইতিহাসের এক স্বীকৃত অধ্যায়।

রাখত। তারা দাবি করত—হাকিম বি আমরিল্লাহই আল্লাহ, যে মানুষের আকৃতিতে অবতীর্ণ হয়েছে। তাদের দলীয় মূলনীতির অন্যতম ছিল—দ্রুজ বাদে বাকি সকল দ্বীন ও মতবাদ অস্বীকার করা। তাদের মতে দ্রুজ বাদে সবাই কাফির। ইসলাম, ইহুদি ও খ্রিষ্টান সবাই তাদের মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত। ইসলামকে তারা ইবলিসি শরিয়ত বলে। আর কিছু দলীয় বিশ্বাস তাদের ছিল। যেমন—পরকালকে অস্বীকার করা ও তাকাম্মুসের প্রতি ঈমান আনা, তাকাম্মুস হিন্দুদের পুনর্জন্ম মতবাদের ন্যায় একটি মতবাদ। নবুওয়ত অস্বীকার ও সকল নবিকে মিথ্যারোপ করা, বিশেষ করে ইসলামের নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। বাতিনি অপব্যাখ্যা। তাদের নিকট সালাত, সিয়াম, জাকাত, হজ ও অন্যান্য ইবাদতের বিশেষ অর্থ রয়েছে। আমরা যা করি তার সঙ্গে এর কোনো মিল নেই। দ্রুজরা বিশ্বাস করে যে, তাদের দ্বীনে বাইরে থেকে কেউ তাতে প্রবেশ করতে পারবে না। ফখরুদ্দিন মুগনি সানি, বাশির শিহাবি, সুলতান আতরাশ ও কামাল জুনবুলাত তাদের গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের অন্যতম।-অনুবাদক

[৭] এদের ব্যাপারে বিভিন্ন বইতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

উমাইয়া শাসনের শেষ দিকে এসে ইসলামি সাম্রাজ্যের বিজয়-রথ থেমে যায়। সাধারণ বা প্রশাসনিক লোকজন ব্যস্ত হয়ে পড়ে অভ্যন্তরীণ গোলযোগে। এর পর আব্বাসিরা ক্ষমতায় এসে বেশ পাকাপোক্তভাবেই মসনদে বসে যায়। লোকজন সাময়িক সময়ের জন্য হলেও স্বস্তি ও শান্তি ফিরে পায়। এই সুযোগেই স্বার্থান্বেষীরা উগরে দিতে থাকে তাদের মনের ভেতর পুষে রাখা যত অভিলাষ। এদের অধিকাংশই ছিল অগ্নিপূজারি। আহলে বাইতের প্রেমিক সেজে যারা 'শিয়া' নাম ধারণ করে। এর পর নিজ গোত্রের কিছু মুসলিমকে সঙ্গে নিয়ে আব্বাসিদের পেছনে লেগে যায়। সফলতাও পেয়ে যায় অল্প সময়ের মধ্যে। বেশ কিছু অঞ্চলে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে নেয় তারা। কোমর বেঁধে মাঠে নেমে পড়ে ইসলামি সাম্রাজ্য ধ্বংসের অভিযানে। এদের ভেতর অন্যতম ছিল—সানবাজ,[৮] মুসলিমিয়া,[৯] রাওয়ান্দিয়া[১০] মুকান্নিয়া[১১] ও বাবাকি ফেতনা।[১২]

---

[৮] ১৩৭ হিজরিতে যখন আবু জাফর মানসুর আবু মুসলিম খোরাসানিকে বাগদাদে হত্যা করে, তখন নিশাপুরে 'সানবাজ' নামে একজন অগ্নিপূজারি সর্দার ছিল। আবু মুসলিমের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব ছিল বেশ পুরনো। আবু মুসলিমই তাকে নিজ শহরে নিয়ে এসেছিল। পরবর্তীকালে তাকে সেনা কমান্ডার পদে উন্নীত করা হয়। আবু মুসলিমকে হত্যার পর সে বিদ্রোহ করে একদল সেনাবাহিনী নিয়ে নিশাপুর থেকে রায়ের দিকে চলে যায়। রায় এবং তাবারিস্তানের অগ্নিপূজারিদেরকে নিজ দলের দিকে আহ্বান করতে থাকে। কিছুদিন পর সে প্রকাশ্যে দাওয়াত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু তার পথের কাঁটা ছিল রায় শহরে খলিফা মনসুর নিযুক্ত গভর্নর আবু উবাইদা হানাফি। প্রথম মাসেই তাকে হত্যা করে এবং সেখানকার রাষ্ট্রীয় কোষাগার দখল করে নেয়। সেখানে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হলে আবু মুসলিম হত্যার রক্তপণ চাইতে শুরু করে। ঘোষণা করে ইরাক ও খোরাসানে আবু মুসলিমের নিযুক্ত প্রতিনিধি। মাজদাকি পূজারিদের সঙ্গে বৈঠকে বসলে বলত—আরবরা সূর্যের পরিবর্তে কাবাকে নিজেদের কেবলারূপে গ্রহণ করেছে। আমি কাবাকে ধ্বংস করে সূর্যকে কেবলা বানিয়ে তবে ফিরব।-অনুবাদক

[৯] এ দ্বারা আবু মুসলিম খোরাসানিকে বোঝানো হয়েছে। তার আলোচনা সামনে বিস্তারিত আসবে।-অনুবাদক

[১০] রাওয়ান্দিয়ারা খুররমিদের একটি গোত্র। মূলত অগ্নিপূজারিদের থেকেই তাদের উৎপত্তি। রাওয়ান এলাকার দিকে সম্বন্ধ করে তাদেরকে রাওয়ান্দিয়া বলা হয়। রাওয়ান্দ ইস্পাহানের কাসর নামক গ্রামে অবস্থিত। তাদের আকিদার অন্যতম ছিল পুনর্জন্মের বিশ্বাস। তারা ধারণা করত, আদম আলাইহিস সালামের আত্মা উসমান ইবনু নাহিকের ভেতরে স্থানান্তরিত হয়েছে। আবু জাফর মনসুর হলো তাদের প্রভু ও হাইসাম ইবনু মুয়াবিয়া হচ্ছে হজরত জিবরাইল। ঐতিহাসিকদের মত হলো, আবু জাফর মনসুরের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত ভক্তি-সম্মান করত মূলত তাকে ঘায়েল করার উদ্দেশ্যে। লক্ষ্য ছিল এভাবে তার কাছাকাছি যেতে পারলেই তাকে হত্যা করা যাবে।-অনুবাদক

[১১] হাশিম ইবনু হাকিম মুকান্নি। তার বাবা খলিফা মনসুরের সময় খোরাসানের সেনাপতি ছিলেন। মুকান্নি বিদ্যাবুদ্ধিতে তুখোড়। জাদুবিদ্যায় সুদক্ষ। অসাধারণ বাকপটুতা কাজে লাগিয়ে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করে নিত সহজেই। মিষ্টি কথায় মুগ্ধ হয়ে লোকজনও তার ভক্ত হয়ে যেত। প্রথমে সে আবু মুসলিম খোরাসানির নেতৃত্বে সাধারণ সৈনিক হিসেবে কাজ করত। পরবর্তীকালে আবদুল জব্বার আজদির 'কাতিব' হিসেবে নিযুক্ত হয়। আবদুল জব্বারের সঙ্গে তাকেও বাগদাদে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে মুক্তি পেয়ে সে মার্ভ চলে যায়। এখানে এসে জাদুবিদ্যা ও ভেলকিবাজি দেখিয়ে আয়-উপার্জনের পথ খোলে। লোকটি দেখতে ছিল খুবই কুৎসিত। এজন্য চেহারার কদর্যতা ঢাকতে স্বর্ণের তৈরি একটি মুখোশ পরে থাকত সবসময়। যদিও তার দাবি ছিল, তার চেহারায় যে নুর ও আলোর ঝলকানি বা তাজাল্লি রয়েছে, মানুষ তা সহ্য করতে পারবে না। এজন্যই সে মুখোশ পরে থাকে। মুখোশের দুই চোখের স্থানে রেখে দিত রেশমের দুটি টুকরো। সে পুনর্জন্ম বিশ্বাসী। তার ভেল্কিবাজির ফেরে পড়ে বহু লোক তার নিঃস্ব অনুসারী হয়ে যায়। অনেকে তো তাকে সিজদাও করতে শুরু করে। রাজ্জানিয়া ও খুররামি আকিদার মিশেলে তৈরি করে অদ্ভুত এক মতবাদ। অনুসারীদের জন্য সমস্ত হারামকে হালাল করে দেয়। রহিত

আব্বাসি আন্দোলন

আব্বাসি আন্দোলনের গোড়ার কথা

আহলে বাইতের প্রতি মুসলিমদের ভালোবাসা ও ঐকান্তিকতাবোধ, বিশেষ করে কারবালার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর থেকে তাদের প্রতি মুসলিমদের সহমর্মিতার সুযোগে একশ্রেণির ক্ষমতালিপ্সু লোক নিজেদের আহলে বাইতের লোক বলে দাবি করতে থাকেন। অনেকে তো নিজেদের আহলে বাইতের সদস্যও দাবি করে বসেন। এমনই একজন ছিলেন মুখতার ইবনু আবি উবাইদ সাকাফি। এই লোক ইরাকে আমিরুল মুমিনিন আলি ইবনু আবি তালিবের সঙ্গে ছিলেন। আমিরুল মুমিনিনের ইন্তিকালের পর তিনি বসরায় বসবাস করতে শুরু করেন। কিন্তু কারবালার ঘটনার পর উবায়দুল্লাহ ইবনু জিয়াদ তাকে কিছুদিন জেলখানায় বন্দি রেখে তারপর তায়েফে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেন। সেখানে থেকে তিনি আবদুল্লাহ ইবনু জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর দলে যোগ দেন। জনগণের সামনে নিজেকে ইবনু জুবাইরের কর্মী হিসেবে প্রচার করতে থাকেন। ইবনু জুবাইরের কাছে ইরাকে তার পক্ষে কাজ করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। ইবনু জুবাইর তাকে অনুমতিও দেন।

সেখান থেকে মুখতার ইরাকে চলে যান। সেখানে তিনি মুহাম্মদ ইবনু আলি ইবনু আবি তালিবের পক্ষে জনগণকে আহ্বান করতে আরম্ভ করেন। যিনি ইবনুল হানাফিয়া নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।[৪৪] ইবনুল হানাফিয়া তাকে নিজের লোক বলে অস্বীকার করেন এবং

[৪৪] মুহাম্মদ ইবনু আলি ইবনু আবি তালিব। ইবনুল হানাফিয়া নামে তিনি সমধিক পরিচিত। ইসলামের প্রথম যুগের নেতা ছিলেন। তিনি শিয়াদের পাক পাঞ্জাতনের অন্যতম সদস্য এবং ইসলামের চতুর্থ খলিফা আলি ইবনু আবি তালিবের সন্তান হিসেবে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পান। তার মায়ের নাম খাওলা বিনতে জাফর হানাফিয়া। আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর অন্যান্য সন্তানদের থেকে তাকে আলাদাভাবে বোঝানোর জন্য মায়ের দিকে সম্বন্ধ করে ইবনুল হানাফিয়া বলা হয়। জ্ঞানবুদ্ধি ও আভিজাত্যে তিনি ছিলেন অনন্য। ছিলেন ইসলামি সাম্রাজ্যের এক বিপ্লবী মহানায়ক। তিনি বলতেন হাসান ও হুসাইন আমার চেয়ে উত্তম বটে; তবে জানাশোনা তাদের চেয়ে আমার বেশি। ১৩ হিজরিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সিফফিনের যুদ্ধ বাবার পক্ষের পতাকা ছিল তার হাতে। তবে কারবালার হৃদয়বিদারক ঘটনার সাক্ষী তিনি হননি। তিনি ইবনু জুবায়েরের আনুগত্য প্রত্যাখ্যান করে তায়েফ পালিয়ে যান। আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ানের বাইআতও প্রত্যাখ্যান করেন। পরবর্তীকালে পরিস্থিতি অনুকূল হলে তিনি

তার ব্যাপারে দায়মুক্তির ঘোষণা দিয়ে জনগণকে তার মিথ্যাবাদিতার ব্যাপারে সতর্ক করে দেন। কিন্তু মুখতার জনগণকে বোঝাতে থাকেন যে—এটি আমাদের ইমামের মহানুভবতা। তিনি তো কখনো চাইবেন না ক্ষমতার মসনদে নিজেকে তুলে ধরতে। বরং আমাদেরকেই নেহায়েত চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইমামকে মসনদে বসাতে হবে। একবার কোনো এক সূত্রে মুহাম্মদ ইবনু আলি খবর পেলেন যে, কিছু লোক দাবি করছেন—আহলে বাইতের কাছে বিশেষ এলেম আছে, যা তারা ছাড়া আর কেউ জানেন না। তখন তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা দিলেন—'আল্লাহর কসম, এই দুই মলাটের মাঝে যা আছে, তা ছাড়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে কিছুই দিয়ে যাননি। এই বলে তিনি কুরআনুল কারিমের দিকে ইশারা করলেন। তার পর আবার বললেন—কেউ যদি বলে থাকেন, আমরা আহলে বাইতরা কুরআন ছাড়া অন্য কিছু পাঠ করি, তাহলে সেই স্পষ্ট মিথ্যাবাদী।'

মুহাম্মদ ইবনু আলি নিজে কখনোই ইমামত বা ক্ষমতার মসনদ কামনা করতেন না। তার ছেলে আবদুল্লাহও[৪৫] এসব ঝুট-ঝামেলা থেকে দূরে থাকতে পছন্দ করতেন। যদিও কাইসানিয়ারা[৪৬] দাবি করেন পিতার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারসূত্রে ইমামতের দায়িত্ব তার কাঁধেই অর্পিত হয়েছে।

আবদুল মালিকের হাতে পুনরায় বাইআত হন। ৮০ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু মুখতারের অনুসারী কাইসানিরা দাবি করেন ইবনুল হানাফিয়া এখনও মৃত্যুবরণ করেননি। তিনি রাদওয়া পাহাড়ের পিছনে লুকিয়ে আছেন। সেখানে তার কাছে পানি ও দুধ মজুদ আছে।

[৪৫] আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মদ ইবনু আলি আহলে বাইতের গুরুত্বপূর্ণ একজন সদস্য ছিলেন। কখনো তিনি মসনদের কাড়াকাড়িতে যাননি। ৯৯ হিজরিতে তিনি হুমাইমায় ইন্তিকাল করেন।

[৪৬] কাইসানিয়া হলো একটি বিলুপ্তপ্রায় শিয়া সম্প্রদায়। হুসাইন ইবনু আলির হত্যার পর ইবনুল হানাফিয়ার অনুসারীরা তার পক্ষে ইমামত দাবি করতে থাকেন। খলিফা আলি ইবনু আবি তালিবের আজাদকৃত দাস কাইসানের দিকে সম্বন্ধ করে তাদেরকে কাইসানিয়া নামকরণ করা হয়েছিল। কারণ, তারা বিশ্বাস করেন যে, কাইসান আলি এবং তার পুত্র মুহাম্মদের কাছ থেকে দুনিয়ার সকলে ইলম ও গোপন রহস্য লাভ করেছেন। আত্মার ইলমসহ জ্যোতিষ বিদ্যাও শিখে নিয়েছেন তিনি। কাইসানিয়াদেরকে যদিও কাইসানের নামে নামকরণ করা হয়েছে, কিন্তু বিপত্তি বেধেছে অন্যখানে। কাইসান নামটি কার, এটা নিয়ে ঐতিহাসিকদের পক্ষ থেকে কয়েক রকম বক্তব্য পাওয়া যায়। **এক.** এটি মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়ার নাম। **দুই.** এটি আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর একজন আজাদকৃত দাসের নাম। **তিন.** এটি মুখতার বিন আবি উবাইদ সাকাফির নাম। **চার.** এটি তার পুলিশের নাম। তার ডাকনাম ছিল 'আবু আমরা'। তার নামও ছিল কাইসান। এরপর এর সূচনা নিয়েও দুটি ভিন্ন মত পাওয়া যায়।

এক. এই মতবাদের সূচনা হয়েছিল কাইসান নামক এক ব্যক্তির হাতে। **দুই.** এই মতবাদের সূচনা হয়েছিল মুখতার ইবনু আবি উবাইদের হাত ধরে। তিনি ইয়াজিদ ইবনু মুআবিয়ার মৃত্যুর পর ৬৪ হিজরিতে ইরাক গমন করে। সেখানে গিয়ে নিজেকে মুহাম্মদ ইবনু আল-হানাফিয়াকে ইমাম ঘোষণা দিয়ে নিজেকে তার কর্মী হিসেবে প্রচার করতে থাকেন। তার সঙ্গে কাইসানও ছিলেন, যাকে তিনি নিজের পুলিশ হিসেবে সাজিয়েছিলেন। তিনি শহরে হুসাইনের হত্যাকারীদের খুঁজে বেড়াতেন। কাউকে পেলে সঙ্গে সঙ্গেই শেষ করে দিতেন। মুখতার ইবনু আবি উবাইদ সাকাফির পরে কাইসানিয়ারা 'মুখতারিয়া' নামেও পরিচিত ওঠেন।

কাইসানিয়াদের দাবি, মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া হলেন মাহদি। তিনিই আলি ইবনু আবি তালিবের উত্তরসূরি। আহলে বাইতের কেউই তার বিরোধিতা করতে পারবেন না। তার ইমামত প্রত্যাখ্যান করতে পারবেন না। তার

বনু উমাইয়ারা বাস্তবিক অর্থেই বনু হাশিমকে খুব সম্মান করতেন। তাদেরকে বিভিন্ন জায়গির প্রদান করতেন। দেওয়া হতো মাসিক ভাতাও। কিন্তু কিছু লোক বনু হাশিমের এক ব্যক্তিকে খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য প্ররোচিত করতে থাকেন। উসকানি পেয়ে তারা বিদ্রোহ করে বসলে খলিফা তাকে-সহ উসকে দেওয়া ব্যক্তিকে চরম শাস্তি দেন। বনু উমাইয়ার কঠোরতাকেও যেমন সমর্থনের সুযোগ নেই, তেমনিভাবে প্রতিষ্ঠিত ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকেও প্রশ্রয় দেওয়া যায় না।

জনগণ একজন ব্যক্তিকে শরয়ি ইমাম দাবি করে তার পক্ষে সমর্থন জোগালেন আর তিনি সুযোগ পেয়ে প্রতিষ্ঠিত ইমামের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমে পড়লেন—এ তো সমর্থন করা যায় না। যিনি কোনোরকম জোর-জুলুম অথবা উত্তরাধিকারীসূত্র ব্যতীতই জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত গ্রহণযোগ্যতা ও বাইআতের মাধ্যমে ক্ষমতার মসনদে আসীন হয়েছেন। যদি আমরা বনু উমাইয়ার ক্ষেত্রে বংশপরম্পরায় ক্ষমতাপ্রাপ্তির সমালোচনা করতে চাই, তাহলে বনু হাশিমসহ অন্য যেকোনো গোত্রের ক্ষেত্রেও তো একই কথা প্রযোজ্য হবে। কারণ, ইসলামি খিলাফত কোনো উত্তরাধিকারী সম্পদ নয়। যে কেউ এর অধিকারী হওয়ার যোগ্যতা রাখেন। বনু হাশিমের নিযুক্ত ইমাম যদি বনু উমাইয়ার প্রতিষ্ঠিত ইমামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হন, তারপরও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সুযোগ নেই। কারণ, শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বিদ্যমান থাকা অবস্থায়ও নিম্নস্তরের লোক ইমাম হতে কোনো বাধা নেই। বিরোধিরা উমাইয়া শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ উসকে দিতে কোনো চেষ্টার অন্ত রাখেনি। আহলে বাইতের কোনো সদস্য মারা গেলেই তারা দোষ চাপাতেন খলিফার ওপরে। বলতেন, উমাইয়ার লোকেরা তাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করেছেন। অথবা তাদেরই কোনো লোক তাকে হত্যা করতে ইন্ধন জুগিয়েছেন।

অনুমতি ছাড়া তরবারি তোলার অধিকারও কারও নেই। এজন্যই তো হাসান ইবনু আলি মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়ার অনুমতি নিয়েই মুআবিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বেরিয়েছিলেন, আবার অনুমতিতেই সন্ধিচুক্তিতে গিয়েছিলেন। এই যে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু ইয়াজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বেরিয়েছিলেন, তা-ও মুহাম্মদের অনুমতিতেই। তারা যদি ইবনুল হানাফিয়ার অনুমতি ছাড়া এসব করতেন, তাহলে তারা ধ্বংস হয়ে যেতেন, পথভ্রষ্ট হয়ে যেতেন। সুতরাং যে মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়ার বিরোধিতা করবে, সে কাফির ও মুশরিক।

হুসাইনের শাহাদতের পর ইবনুল হানাফিয়া আল-মুখতার ইবনু আবি উবাইদকে ইরাকে নিজের কর্মী হিসেবে পাঠিয়েছেন। তাকে হুসাইনের হত্যাকারীদের খুঁজে বের করে রক্তপণ দাবি করতে এবং তাদেরকে যেখানেই পাবেন সেখানেই হত্যা করতে আদেশ করেছিলেন। নিজের বিচক্ষণতার কারণে তিনি কাইসান (জ্ঞানী) নাম ধারণ করেন। তারা নিজেদেরকে মুখতারিয়া বললেও মূলত তাদেরকেই কাইসানিয়া বলা হয়। শাহরিস্তানি বর্ণনা করেছেন যে, মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া যখন জানতে পারেন যে, তিনি নিজেকে তার প্রচারকদের একজন বলে দাবি করছেন, তখন মুখতারকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। ইবনুল হানাফিয়ার মৃত্যুর পর এই কাইসানিরা বলতে থাকেন যে, মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া তিহামা পর্বতমালার রাদওয়া পর্বতের পেছনে একটি সিংহ এবং একটি বাঘের মধ্যে বসবাস করছেন। সে দুটি প্রাণী তাকে রক্ষা করছে। তার কাছে দুটি ঝরনা রয়েছে। একটি মধুর, অপরটি পানির। একসময় তিনি আত্মগোপন থেকে বের হয়ে আসবেন এবং অরাজকতাপূর্ণ পৃথিবীকে তিনি শান্তির নীড়ে পরিণত করবেন। *আলমিলাল ওয়ান্নিহাল,* পৃষ্ঠা : ৯৩, আলফিরাক বাইনাল ফিরাক।—অনুবাদক

বিরোধীদের প্রচার মাধ্যম মজবুত হওয়ায় লোকেরা সহজেই তাদের কথা বিশ্বাস করে নিতেন।

বনু উমাইয়ার লোকেরা যে বনু হাশিমকে সম্মান করতেন, তার অন্যতম প্রমাণ হলো আলি ইবনু আবদিল্লাহ ইবনু আব্বাসের সঙ্গে খলিফা ওয়ালিদ ইবনু আবদুল মালিকের সম্মানজনক আচরণ। খলিফা জর্দানের বালকা শহরে 'হুমাইমা' নামক গ্রামে তার জন্য স্থাবর সম্পত্তি লিখে দেন। তার পর থেকে আলি ইবনু আবদিল্লাহ সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

একবার আবু হাশিম আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মদ দামেশকে উমাইয়া খলিফা সুলাইমান ইবনু আবদুল মালিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সুলাইমান তাকে উষ্ণ আলিঙ্গনে বুকে জড়িয়ে নেন। ফেরার সময় তার হাতে তুলে দেন বহু উপঢৌকন। সেখান থেকে আবু হাশিম মদিনা মুনাওয়ারায় চলে আসেন। পথিমধ্যে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে বুঝতে পারেন যে, মৃত্যুর হয়তো আর বেশি দেরি নেই। একথা তিনি তার সহযাত্রীদের খুলে বলেন। তখন কেউ কেউ বলে ওঠেন—মনে হয় সুলাইমান আপনাকে গোপনে বিষপ্রয়োগ করেছেন। এতে আবু হাশিমের মনে সন্দেহের দানা বাঁধতে শুরু করে। সাধারণত অসুস্থ ব্যক্তিরা একটু আশঙ্কাপ্রবণ হয়ে থাকেন। এ খবর ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। তখন সন্দেহ পরিণত হয় নিশ্চিত সংবাদে। আবু হাশিমের মনে উমাইয়াদের প্রতি সৃষ্টি হয় চরম অসন্তোষ। তিনি হুমাইমায় লোক পাঠান। পুরো ঘটনা খুলে বলেন ভাতিজা মুহাম্মদ ইবনু আলি ইবনু আবদিল্লাহ ইবনু আব্বাসের কাছে। তাকে অনুরোধ করেন শীঘ্রই তুমি বনু উমাইয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করো।

এখন কথা হলো—বাস্তবেই যদি আবু হাশিমকে বিষপ্রয়োগ করা হতো, তাহলে তো তিনি তৎক্ষণাৎ মারা যেতেন। কারণ, সেকালে রাজা-বাদশারা সাধারণত কোনো বিষ ঘরে রাখতেন না। কিন্তু আবু হাশিম সুলাইমানের কাছ থেকে আসার পরে আরও দুই মাস বেঁচেছিলেন। এটি ৯৯ হিজরির ঘটনা।

কিছু উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বর্ণনাকারী দাবি করেছেন যে, আবু হাশিম ভাতিজা মুহাম্মদ ইবনু আলি আব্বাসিকে আন্দোলনের বিভিন্ন পথ ও পদ্ধতি ও সাংগঠনিক দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে যান। অথচ সেই সময়ই কোনোরকম সাংগঠনিক কাঠামোই বিদ্যমান ছিল না। বরং আবু হাশিম এবং তার পিতা মুহাম্মদ ইবনু আলি ইবনু আবি তালিব কাইসানিদের থেকে নিজের দায়মুক্তির কথা ঘোষণা করতেন। কারণ, এরা ইতিহাসের শুরু থেকেই ধর্মত্যাগী ছিলেন। সুতরাং বর্ণনাকারীদের দাবিকৃত কাইসানিদের সঙ্গে বনু আব্বাসের কোনো ধরনের সম্পর্ক থাকতে পারে না।

বাস্তবতা হলো—মুহাম্মদ ইবনু আলি আব্বাসির কানে আবু হাশিমের প্রস্তাব অনেকটা সহযোগিতার আশ্বাস জোগায়। কারণ, তিনিও খিলাফতের ব্যাপারে অনেকটা উৎসাহী

ছিলেন। তার ভাই ছিলেন বিশজনেরও অধিক। প্রত্যেকেই তার প্রতি সহযোগিতামূলক মানসিকতা প্রকাশ করতেন। এর ফলে তারা বিশেষ একটি শক্তিতে পরিণত হন। এদিকে তার পিতা আলি ইবনু আবদিল্লাহ ইবনু আব্বাস মৃত্যুর সময় তাকে আন্দোলনের পথে অব্যাহত থাকার প্রতি উৎসাহ জুগিয়ে যান। ১১৭ হিজরিতে তিনি মৃত্যুবরণ করার আগ পর্যন্ত ছেলেকে এ ব্যাপারে সর্বদা উৎসাহ দিতেন। সবকিছু মিলিয়ে মুহাম্মদ ইবনু আব্বাস খুশিমনে আব্বাসি আন্দোলনের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন এবং নেমে পড়েন সেই লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পথে।[৪৭]

প্রথমেই তিনি এমন একটি জায়গা নির্বাচনের দিকে মনোযোগ দেন, যেখান থেকে নির্বিঘ্নে আন্দোলন পরিচালনা করা সম্ভব হবে। তবে সে জায়গাটি হুমাইমা থেকে দূরে হলেই বেশি ভালো হয়। যাতে করে মানুষের দৃষ্টি সেখান থেকে সরিয়ে রাখা যায়। নতুন কোনো আন্দোলন সফল করার সবচেয়ে সুন্দর উপায় হলো, আন্দোলনের মূল নেতাকে অপরিচিত রাখা। যাতে করে বনু উমাইয়া-বিরোধী সকল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ রাখা যায়। কারণ, নির্দিষ্ট একজনকে ইমাম বানালে অন্য দল সরে পড়তে পারে এবং আন্দোলন সীমাবদ্ধ হয়ে যেতে পারে স্রেফ একটি দলের মাঝে। কারণ, বনু হাশিমের প্রতিটি দলই চাইতেন তাদের পছন্দের লোককে ইমাম বানাতে হবে।

এজন্য মুহাম্মদ ইবনু আলি আব্বাসি কৌশল করে দুটি বিষয় সামনে রেখে আন্দোলন শুরু করেন। একটি হলো হাশিমি জাতীয়তাবাদ। আরেকটি আহলে বাইতের প্রতি সমর্থন। এতে করে যেমন আলি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সন্তানরা অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, পাশাপাশি আব্বাস, জাফর, ওয়াকিলের সন্তানদেরও আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করার পথে কোনো বাধা না থাকে। সম্মিলিত সিদ্ধান্তে আন্দোলনের কেন্দ্র হিসেবে বেছে নেওয়া হয় কুফাকে। কারণ, কুফা ছিল তখন বনু উমাইয়া-বিরোধীদের মূল ঘাঁটি। সেখানে আগে থেকেই আলি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বংশধর এবং তাদের অনুসারীরা অবস্থান করে আসছিলেন। ইতিপূর্বে এই শহরে মুসলিম ইবনু আকিল[৪৮], মুখতার সাকাফি, মুসআব ইবনু জুবাইর[৪৯] ও আবদুর রহমান ইবনু

---

[৪৭] *আল-আলাবিয়্যান ওয়াল আব্বাসিয়্যান ওয়া দাওয়াতু আলিল বাইত,* পৃষ্ঠা : ৫১-৫৮।–নিরীক্ষক

[৪৮] মুসলিম ইবনু আকিল ছিলেন আকিল ইবনু আবি তালিবের পুত্র এবং হুসাইন ইবনু আলির চাচাতো ভাই। সম্মানিত তাবিয়ি তিনি। অবস্থান করতেন মক্কায়। কুফার জনতা হুসাইন ইবনু আলির কাছে উমাইয়াদের উৎখাতের আবেদন জানান। হুসাইন কুফার জনগণের আনুগত্য নিশ্চিত হওয়া ও সেখানকার পরিস্থিতি বোঝার জন্য মুসলিম ইবনু আকিলকে কুফায় পাঠান। ১৮,০০০ হাজার লোক তার হাতে আনুগত্যের বাইআত নেন। কুফায় নিযুক্ত উমাইয়া গভর্নর বিষয়টি টের পেয়ে যায়। তিনি মুসলিমকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়ান। প্রথমদিকে লোকজন কিছুটা সুরক্ষা দিলেও পরবর্তীকালে নিজেদের জানপ্রাণ বাঁচাতে তারা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। মুসলিম ইবনু আকিল হুসাইনের উদ্দেশে চিঠি লেখেন। ৬০ হিজরিতে গভর্নর উবাইদুল্লাহ ইবনু জিয়াদ তাকে মৃত্যুদণ্ড দেন। কুফার জামাল মসজিদের পেছনে তাকে দাফন করা হয়।

আব্বাসি খিলাফতের ইতিহাস

[দ্বিতীয় খণ্ড]

বই	**আব্বাসি খিলাফতের ইতিহাস (২য় খণ্ড)**
লেখক	শাইখ মাহমুদ শাকির
অনুবাদক	শাহ মুহাম্মাদ খালিদ, জমির মাসরূর
নিরীক্ষণ	মাহদি হাসান
ভাষা-বিন্যাস	কুতুব হিলালী
বানান সমন্বয়	মুহাম্মদ পাবলিকেশন সম্পাদনা পর্ষদ
প্রচ্ছদ	আবুল ফাতাহ মুন্না
অঙ্গসজ্জা	মুহাম্মদ পাবলিকেশন গ্রাফিক্স টিম

আব্বাসি খিলাফতের ইতিহাস

[দ্বিতীয় খণ্ড]

শাইখ মাহমুদ শাকির

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

মানচিত্র সূচি

আব্বাসি খলিফাদের বংশধারা	:	৮৮ (১ম খণ্ড)
রুস্তমীয় বংশধর ইবাদিয়্যাহ	:	১১৯
তুলুনি সাম্রাজ্য	:	১২০
সাফফারিয়া সাম্রাজ্য	:	১২৩
আগলাবিয়া সাম্রাজ্য	:	১৩০
মাগরিব অঞ্চলে ইদরিসিয়া সাম্রাজ্য	:	১৩৮
খারিজি সুফরিয়্যাহ সাম্রাজ্য	:	১৪২
হামদানিয়্যাহ সাম্রাজ্য	:	১৬১
সামানি সাম্রাজ্য	:	১৬৪
বুওয়াইহি সাম্রাজ্য	:	১৭৩
বিভিন্ন রাজত্ব ও সাম্রাজ্য	:	২৪৩
ক্রুসেড যুদ্ধ	:	২৯৯
উবাইদি খলিফাদের তালিকা	:	৩০৮
সেলজুক সাম্রাজ্য	:	৩২০
জিরি সাম্রাজ্য	:	৩৩৩
আইয়ুবি সাম্রাজ্যের সুলতানগণ	:	৩৬৮
মুওয়াহহিদিন সাম্রাজ্য	:	৩৭৪
তাতার (মোঙ্গল) সাম্রাজ্য	:	৪০৪

সূ চি প ত্র

দ্বিতীয় খণ্ড

ভূমিকা ১৭

এক. খিলাফতের কেন্দ্রে সামরিক বাহিনীর আধিপত্য ১৯
দুই. গড়ে ওঠা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাম্রাজ্য ৩৩
তিন. বাতিনি আন্দোলন বা গোপন ষড়যন্ত্র ৪৫
চার. ক্রুসেড যুদ্ধ ৪৮
পাঁচ. মোঙ্গল অগ্রাসন ৫২
দ্বিতীয় পর্যায়ের আব্বাসি খলিফাগণের তালিকা ৫৫

প্রথম অধ্যায়

তুর্কি সেনাপতিদের কর্তৃত্বকাল-৫৭

আল-মুনতাসির বিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু জাফর আল-মুতাওয়াক্কিল ৫৯
বিচ্ছিন্ন সাম্রাজ্যসমূহ ৬১
আল-মুসতাইন বিল্লাহ আহমদ ইবনু মুহাম্মদ আল-মুতাসিম ৫৭
আল-মুতাজ বিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু জাফর আল-মুতাওয়াক্কিল ৬৮
আল-মুহতাদি বিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু হারুন আল-ওয়াসিক ৭২
আল-মুতামিদ আলাল্লাহ আহমদ ইবনু জাফর আল-মুতাওয়াক্কিল ৮০
বিভিন্ন আন্দোলন ও বিদ্রোহ ৮৩
খারিজি বিদ্রোহ ৮৩
জানজি বিদ্রোহ ৮৪
কারামিতা ও ইসমাইলি শিয়াগোষ্ঠী ৮৮
রোমান সাম্রাজ্য ৯৫
বিচ্ছিন্ন রাজত্বসমূহ ৯৭
১. স্পেনের (আন্দালুসিয়া) উমাইয়া সাম্রাজ্য ৯৭
২. ইদরিসিয়া সাম্রাজ্য ৯৮

৩. ইবাদিয়া ও রুস্তমিয়া খারিজিদের সাম্রাজ্য ৯৮
৪. খারিজি সুফরি মিদরারি সাম্রাজ্য ৯৮
৫. আগলাবিয়া সাম্রাজ্য ৯৯
৬. ইয়েমেনে বনু জিয়াদের রাজত্ব ১০০
৭. বনু ইয়াফুরের রাজত্ব ১০০
৮. তুলুনি সাম্রাজ্য ১০০
৯. সাফফারিয়া সাম্রাজ্য ১০৩
১০. সামানি সাম্রাজ্য ১০৪
১১. তাবারিস্তানে তালিবি সাম্রাজ্য ১০৫
আল-মুতাজিদ বিল্লাহ আহমদ ইবনু তালহা
আল-মুওয়াফফাক ইবনু জাফর মুতাওয়াক্কিল ১০৭
কারামিতা ১০৯
বিভিন্ন সাম্রাজ্য ও রাজত্ব ১১৭
১. স্পেনে উমাইয়া সাম্রাজ্য ১১৭
২. ইদরিসিয়া রাজত্ব ১১৭
৩. সিজিলমাসায় খারিজি সুফরিয়াদের রাজত্ব ১১৭
৪. তিয়ারেতে ইবাদিয়া খারিজিদের রাজত্ব ১১৮
৫. আগলাবিয়া সাম্রাজ্য ১১৯
৬. তুলুনি সাম্রাজ্য ১১৯
৭. জাবিদে বনু জিয়াদের রাজত্ব ১২১
৮. সানায় বনু ইয়াফুরের রাজত্ব ১২১
৯. সাদায় জাইদিদের রাজত্ব ১২১
১০. সাফফারিয়া সাম্রাজ্য ১২২
১১. সামানি সাম্রাজ্য ১২৩
১২. তাবারিস্তানে তালিবি রাজত্ব ১২৪
আল-মুকতাফি বিল্লাহ আলি ইবনু আহমাদ আল-মুতাজিদ ১২৫
আল-মুকতাদির বিল্লাহ জাফর ইবনু আহমদ আল-মুতাজিদ ১৩১
রোমান সাম্রাজ্য ১৩৩
কারামিতা ১৩৪
বিভিন্ন রাজত্ব ও সাম্রাজ্য ১৩৬
১. স্পেনে উমাইয়া সাম্রাজ্য ১৩৬
২. ইদরিসিয়া সাম্রাজ্য ১৩৭
৩. তিয়ারাতে ইবাদিয়া খারিজিদের সাম্রাজ্য ১৩৮
৪. সিজিলমাসায় খারিজি সুফরিয়াদের রাজত্ব ১৩৯

৫. সামানি সাম্রাজ্য ১৪৩
৬. হামদানি সাম্রাজ্য ১৪৪
আল-কাহির বিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু আহমদ আল-মুতাজিদ ১৪৬
আর-রাজি বিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু জাফর মুকতাদির ১৪৮
আল-মুত্তাকি বিল্লাহ ইবরাহিম ইবনু জাফর আল-মুকতাদির ১৫১
আল-মুসতাকফি বিল্লাহ আবদুল্লাহ ইবনু আলি আল-মুকতাফি ১৫৪
বিভিন্ন রাজ্য ১৫৬
১. স্পেনে (আন্দালুসিয়া) উমাইয়া রাজত্ব ১৫৬
২. উবাইদি রাজত্ব ১৫৬
৩. ইখশিদিয়া সাম্রাজ্য ১৫৮
৪. হামদানি সাম্রাজ্য ১৬০
৫. সামানি সাম্রাজ্য ১৬২
কারামিতা সম্প্রদায় ১৬২

দ্বিতীয় অধ্যায়

সশস্ত্র বুওয়াইহি গোষ্ঠীর কর্তৃত্বকাল-১৬৫

১১৩ বছরের ইতিহাস ১৬৭
আল-মুতি লিল্লাহ ফজল ইবনু জাফর আল-মুকতাদির ১৭৪
রোম সাম্রাজ্য ১৭৬
বিভিন্ন রাজত্ব ও সাম্রাজ্য ১৭৯
১. বুওয়াইহি গোষ্ঠী ১৭৯
২. হামদানি রাজত্ব ১৮০
৩. সামানি সাম্রাজ্য ১৮৫
৪. কারামিতা সম্প্রদায় ১৮৭
৫. ইখশিদিয়া রাজবংশ ১৮৮
৬. উবাইদি সাম্রাজ্য ১৯০
৭. উমাইয়া সাম্রাজ্য (আন্দালুসিয়া) ১৯৪
৮. ইয়েমেন ১৯৫
তায়ি লিল্লাহ আবদুল কারিম ইবনু ফজল আল-মুতি ১৯৬
রোমান সাম্রাজ্য ১৯৭
বিভিন্ন সাম্রাজ্য ও রাজত্ব ১৯৯
১. বুওয়াইহি সাম্রাজ্য ১৯৯
২. হামদানি সাম্রাজ্য ২০৩

৩. সামানি সাম্রাজ্য ২০৪
৪. গজনবি সাম্রাজ্য ২০৪
৫. কারামিতা ২০৫
৬. উবাইদি সাম্রাজ্য ২০৭
৭. স্পেনে উমাইয়া সাম্রাজ্য ২০৯
৮. ইয়েমেন ২১০
আল-কাদির বিল্লাহ আহমদ ইবনু ইসহাক ইবনু মুকতাদির ২১১
বিভিন্ন সাম্রাজ্য ও রাজত্ব ২১৪
১. বুওয়াইহি সাম্রাজ্য ২১৪
২. হামদানি সাম্রাজ্য ২১৫
৩. সামানি সাম্রাজ্য ২১৬
৪. গজনবি সাম্রাজ্য ২১৭
৫. উবাইদি রাজত্ব ২২১
৬. স্পেনে উমাইয়া সাম্রাজ্য ২২৬
৭. ইয়েমেন ২২৮
আল-কায়িম বি আমরিল্লাহ
আবদুল্লাহ ইবনু আহমদ আল-কাদির ২৩০
মামলুক ২৩০
তুঘরিল বেকের পদার্পণ ২৩১
বিভিন্ন রাজত্ব ও সাম্রাজ্য ২৩৫
১. বুওয়াইহি ২৩৫
২. সেলজুক সাম্রাজ্য ২৩৬
৩. গজনবি সাম্রাজ্য ২৩৮
৪. উবাইদি সাম্রাজ্য ২৪০
৫. স্পেন (আন্দালুসিয়া) ২৪১
৬. ইয়েমেন ২৪১

তৃতীয় অধ্যায়

সেলজুক সাম্রাজ্যের কর্তৃত্বকাল-২৪৫

৪৪৭ হিজরি থেকে বাগদাদের পতন পর্যন্ত ২৪৭
আল্প আরসালানের শাহাদত ২৫৯
এই সময়ের আব্বাসি খলিফাগণের তালিকা— ২৬০
আল-মুকতাদি বি আমরিল্লাহ আবদুল্লাহ

ইবনে মুহাম্মদ ইবনু আবদিল্লাহ আল-কায়িম ২৬১
বিভিন্ন বিজয় ২৬২
বিভিন্ন সাম্রাজ্য ও রাজত্ব ২৬৪
১. সেলজুক সাম্রাজ্য ২৬৪
২. খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য ২৬৮
৩. গজনবি সাম্রাজ্য ২৬৯
৪. উবাইদি সাম্রাজ্য ২৬৯
৫. বনু জিরি রাজত্ব ২৬৯
৬. মিগরাবি রাজত্ব ২৭০
৭. মুরাবিতিন সাম্রাজ্য ২৭১
৮. স্পেন ২৭৬
৯. ইয়েমেন ২৮০
আল-মুস্তাজহির বিল্লাহ আহমাদ ইবনু
আবদিল্লাহ আল-মুকতাদি ২৮২
বিভিন্ন সাম্রাজ্য ও রাজত্ব ২৮৩
১. সেলজুক সাম্রাজ্য ২৮৩
তিন. বাতিনিদের সঙ্গে লড়াই ২৮৬
চার. ক্রুসেডারদের সঙ্গে লড়াই ২৮৭
২. খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য ২৮৭
৩. গজনবি সাম্রাজ্য ২৮৭
৪. উবাইদি সাম্রাজ্য ২৮৮
৫. জিরি রাজবংশ ২৮৯
৬. স্পেন ও মুরাবিতিন সাম্রাজ্য ২৯০
৭. ইয়েমেন ২৯১
ক্রুসেড যুদ্ধ ২৯৩
আল-মুস্তারশিদ বিল্লাহ ফজল ইবনু
আহমাদ আল-মুস্তাজহির ৩০০
বিভিন্ন রাজত্ব ও সাম্রাজ্য ৩০৩
১. সেলজুক সাম্রাজ্য ৩০৩
২. খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য ৩০৬
৩. গজনবি রাজত্ব ৩০৬
৪. উবাইদি সাম্রাজ্য ৩০৬
৫. বনু জিরি রাজবংশ ৩০৮
৬. মুরাবিতিন রাজত্ব ৩০৯

৮. স্পেন ৩০৯
৯. ইয়েমেন ৩০৯
ক্রুসেড যুদ্ধ ৩১১
আর-রাশিদ বিল্লাহ মানসুর
ইবনে ফজল মুস্তারশিদ ৩১৪
আল-মুকতাফি লি আমরিল্লাহ মুহাম্মদ
ইবনে আহমদ মুস্তাজহির ৩১৬
বিভিন্ন রাজত্ব ও সাম্রাজ্য ৩১৮
১. সেলজুক সাম্রাজ্য ৩১৮
২. খাওয়ারিজম ৩২০
৩. গজনবি সাম্রাজ্য ৩২১
৪. ঘুরি সাম্রাজ্য ৩২১
৫. জিনকি বংশ ৩২৩
৬. উবাইদি সাম্রাজ্য ৩২৯
৭. বনু জিরি রাজবংশ ৩৩১
৮. মুরাবিতিন সাম্রাজ্য ৩৩৩
৯. মুওয়াহহিদিন রাজত্ব ৩৩৪
১০. স্পেন ৩৩৪
১১. ইয়েমেন ৩৩৫
ক্রুসেড যুদ্ধ ৩৩৭
আল-মুস্তানজিদ বিল্লাহ ইউসুফ
ইবনু মুহাম্মদ আল-মুকতাফি ৩৪০
বিভিন্ন রাজত্ব ও সাম্রাজ্য ৩৪২
১. সেলজুক সাম্রাজ্য ৩৪২
২. খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য ৩৪২
৩. ঘুরি সাম্রাজ্য ৩৪২
৪. জিনকি সাম্রাজ্য ৩৪৩
৫. উবাইদি সাম্রাজ্য ৩৪৪
৬. মুওয়াহহিদিন সাম্রাজ্য ৩৪৯
৭. ইয়েমেন ৩৫০
৮. অনেকগুলো গোষ্ঠীর আত্মপ্রকাশ ৩৫০
ক্রুসেড যুদ্ধ ৩৫২
আল-মুস্তাজি বি আমরিল্লাহ হাসান
ইবনে ইউসুফ আল-মুস্তানজিদ ৩৫৩

আন-নাসির লি দীনিল্লাহ আহমদ
ইবনু হাসান আল-মুস্তাজি ৩৫৫
আজ-জাহির বি আমরিল্লাহ মুহাম্মদ
ইবনু আহমদ আন-নাসির ৩৫৭
বিভিন্ন রাজত্ব ও সাম্রাজ্য ৩৫৮
১. সেলজুক সাম্রাজ্য ৩৫৮
২. খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য ৩৫৮
৩. ঘুরি বংশ ৩৬০
৪. জিনকি সাম্রাজ্য ৩৬০
৫. আইয়ুবি সাম্রাজ্য ৩৬২
৬. মুওয়াহহিদিন সাম্রাজ্য ৩৬৯
ক্রুসেড যুদ্ধ ৩৭৫
এ সময়ের ক্রুসেড অভিযানসমূহ ৩৮৩
আল-মুস্তানসির বিল্লাহ মানসুর
ইবনু মুহাম্মদ আজ-জাহির ৩৮৫
আল-মুস্তাসিম বিল্লাহ আবদুল্লাহ ইবনু
মানসুর আল-মুস্তানসির বিল্লাহ ৩৮৭
তাতারি আগ্রাসন ৩৮৯
পরিশিষ্ট ৪০৫

আব্বাসি খিলাফতের ইতিহাস

দ্বিতীয় খণ্ড

ভূমিকা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য। দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক নবিকুল শিরোমণি হজরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবি, পরিবার ও হিদায়াতের অনুসারী সম্মানিত ইমামগণের ওপর। পর সমাচার—
আব্বাসি শাসনামলের দ্বিতীয় ধাপটি ছিল বড় বন্ধুর, বড় সংকুল ও নানা সংকটে আকীর্ণ একটি বিপর্যস্ত ধাপ। মুসলিমদের কাঁধে চেপে বসেছে তখন চতুর্মুখী ঝঞ্ঝাট। ধপধপ করে ভেঙে পড়তে শুরু করে ইসলামি সাম্রাজ্যের মজবুত প্রাচীর। দুঃখের বিষয় হচ্ছে, সে সময় থেকে আজ অবধি এই এত শতাব্দী পরও মুসলিমরা সেই ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারেননি। সে সময়টিকে শুধু পতনের যুগ বললে ভুল বলা হবে। বরং আরও নানাবিধ বিবেচনায় সময়টি ছিল অনিশ্চয়তায় ঘেরা এক মহাদুর্বোধ্য অশনিকাল।

কারণ, প্রথমত সেসময় তাদের অভ্যন্তরীণ নানাবিধ জটিলতা চরম আকার ধারণ করেছিল। এর পাশাপাশি আত্মপ্রকাশ করেছিল আঞ্চলিকভাবে শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ কিছু খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন সাম্রাজ্য। যারা নিজ নিজ অবস্থান থেকে ইসলাম-বিরোধী শিবিরকে প্রতিরোধের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। যেমন শাম অঞ্চলে আত্মপ্রকাশ করেন জিনকি ও আইয়ুবি পরিবার। তারা ক্রুসেড বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নিয়োজিত থাকেন। শামের উত্তরাঞ্চল, মসুল ও আলেপ্পোতে সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন হামদানিরা। বাইজেন্টাইনদের বিরুদ্ধে তারা দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ-লড়াই অব্যাহত রেখেছিলেন। আফগানিস্তানে আত্মপ্রকাশ করেন গজনবি পরিবার। তারাও অব্যাহত অভিযানের মাধ্যমে হিন্দুস্তানের উল্লেখযোগ্য অংশ অধিগ্রহণ করে নিতে সক্ষম হন। গজনবিরা হিন্দুস্থানের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে দেন ইসলামের মহান বাণী। এভাবে বিভিন্ন ব্যক্তি, পরিবার কিংবা উপলক্ষকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাম্রাজ্য বা অধিরাজ্য। এসব সাম্রাজ্য বাগদাদে অবস্থিত খিলাফতের মূল কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত বা অনুগত থাকলেও পরবর্তী সময় এসে তারা নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। মোদ্দাকথা ইসলামি সাম্রাজ্যের পতনের পেছনে এমন উদ্ভূত কয়েকটি কারণ

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; যার প্রতিটি বিষয়কে স্বতন্ত্র ভূমিকায় আলোচনা করা জরুরি। যাতে করে পাঠকের সামনে সে সময়কার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটগুলো স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়ে ওঠে।

ইতিহাসের গ্রন্থগুলোতে আমরা দেখতে পাই যে, অধিকাংশ ইতিহাসবিদ ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে চোখ সরিয়ে অন্যদিকে চলে গেছেন। অথচ প্রতিটি যুগের রাজনৈতিক চালচিত্র আমাদের বর্তমান সময়ে বুদ্ধিবৃত্তিক রাজনীতিচর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে; যেখান থেকে আমরা খুঁজে নিতে পারি রাষ্ট্র-রাজনীতির অপরিচিত সকল অধ্যায়। তাই ২৪৭ হিজরি থেকে ৬৫৬ হিজরি পর্যন্ত মোট ৪০০ বছরের ইতিহাস আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

সে সময়ের সামগ্রিক অবস্থার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক সামনে রেখে নিচের শিরোনামগুলো বিশ্লেষণ করলেই বিষয়গুলো আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

এক. কেন্দ্রের ওপর সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ।

দুই. বিভিন্ন অঞ্চলে কেন্দ্র থেকে পাঠানো সেনাপতিদের বিদ্রোহের ফলে গড়ে ওঠা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাম্রাজ্য। বিষয়টি এমন বেগতিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, খলিফারা তাদের সামনে একপ্রকার অসহায় হয়ে পড়েছিলেন এবং তাদেরকে সেসব এলাকা নির্বিঘ্নে শাসন করতে দিতে বাধ্য হয়ে পড়েছিলেন।

তিন. ফালসাফা তথা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও বিলাস-ব্যসনসহ সকল ক্ষেত্রে সভ্যতা-সমৃদ্ধির চরম উৎকর্ষ ও ভোগ-উপভোগের সরঞ্জামাদি ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়া।

চার. হাশিমি বংশীয় দাবি করে ইসলাম রক্ষার নামে বিভিন্ন আন্দোলন গড়ে ওঠা। এইসব আন্দোলন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে খিলাফতের অভ্যন্তরে আবার বাতিনি আন্দোলনের মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা।

পাঁচ. ইসলামি ভূখণ্ডসমূহে ক্রুসেড বাহিনীর মুহুর্মুহু আক্রমণ।

ছয়. মোঙ্গল আক্রমণ ও আব্বাসি খিলাফতের পতন। ৬৫৬ হিজরিতে বাগদাদের পতন সমাপ্তি ঘটিয়ে দেয় ইতিহাসের সুদীর্ঘ এই অধ্যায়ের।

উল্লিখিত প্রতিটি বিষয় নিয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ; যাতে করে এ সময়সমষ্টির পূর্ণাঙ্গ একটি নকশা বা চালচিত্র পাঠকের সামনে স্পষ্ট হয়ে যায়। এর পর ধারাবাহিকভাবে খলিফাদের আলোচনা করব। এবং সেখানে তুলে ধরব প্রত্যেক খলিফার শাসনামলে ঘটে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো। তবে এই ভূমিকাটিতে আমি কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন সাম্রাজ্যগুলো নিয়ে বিস্তারিত ও ধারাবাহিক কোনো আলোচনা করার সুযোগ পাব না হয়তো। তবে বিচ্ছিন্নভাবে কোথাও কোথাও উল্লেখ করা হতে

পারে। অথবা যে খলিফার যুগে যে অঞ্চল বিচ্ছিন্ন হয়েছে, তার অধ্যায়ে সামান্য আলোচনা করা হতে পারে। সে সূত্রেই ক্রুসেড যুদ্ধ ও মোঙ্গল আক্রমণের প্রেক্ষাপট ও ইতিহাস নিয়ে বিচ্ছিন্ন কিছু আলোচনা করা হয়েছে। বিস্তারিত পর্যালোচনা অন্য কোথাও হবে ইনশাআল্লাহ। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে প্রার্থনা যে, তিনি যেন আমাকে সুন্দরভাবে বিষয়গুলো আলোচনা করার তাওফিক দান করেন এবং তাঁর কাছে সাহায্য কামনা করি, যেন তিনি আমার এই কাজটুকু তাঁর সন্তুষ্টির উসিলা হিসেবে কবুল করে নেন। সকল ভরসা সেই মহান রবের ওপর, হিদায়াতের ধারক একমাত্র তিনিই। শুরু করছি সেই মহান রবের নামে।

এক. খিলাফতের কেন্দ্রে সামরিক বাহিনীর আধিপত্য

তৎকালে সামরিক ব্যবস্থাপনা ও সশস্ত্র বাহিনীর ধরন ছিল একেবারেই ভিন্ন। বর্তমান পৃথিবীর সামরিক ব্যবস্থাপনার সঙ্গে তার কোনো মিল ছিল না। যুদ্ধ-জিহাদ কিংবা কোনো অভিযানের প্রয়োজন হলে খলিফার পক্ষ থেকে ঘোষণা দেওয়া হতো। সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য মানুষ দলে দলে ছুটে আসতেন। অধিকাংশ যুদ্ধ অমুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংঘটিত হওয়ার দরুন বহু লোক নিজেদেরকে অকুণ্ঠচিত্তে আল্লাহর পথে উৎসর্গ করে দিতে চাইতেন। তবে গনিমতের লোভে যুদ্ধে শরিক হওয়ার মতো লোকও কম ছিলেন না। কারণ, শরয়ি যুদ্ধ বা গোত্রীয় লড়াই—সব ক্ষেত্রেই সে যুগে প্রচুর গনিমত প্রাপ্তির সুযোগ ছিল।

উমাইয়া খিলাফতের শেষ দিকে মুসলিম বাহিনীর পক্ষ থেকে যুদ্ধ-অভিযানের পরিমাণ যখন একেবারে কমে আসে, মানুষের অন্তর থেকে উঠে যেতে থাকে জিহাদের স্পৃহা। তখন খলিফাগণ নির্দিষ্ট এলাকায় নির্ধারিত বাহিনীকে অভিযানে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করতে শুরু করেন। এ সময়কার অধিকাংশ যুদ্ধই ছিল রাষ্ট্রদ্রোহী, অপরাধী, বিদ্রোহীদের ও রাষ্ট্রসমালোচকদের বিরুদ্ধে। এসব ক্ষেত্রে খলিফা নির্দিষ্ট একজনের হাতে পুরো বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ তুলে দিতেন। পুরো বাহিনী তার নেতৃত্বে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন। তবে একটি অভিযান বা একটি রণাঙ্গন শেষ হতেই পালটে যেত সেনাপতির পদ। নতুন কোনো অভিযান সামনে এলে ঘোষণা হতো নতুন আমিরের নাম। গতকাল যিনি ছিলেন সাধারণ একজন সৈনিক, আচমকা তার নাম চলে আসে সেনাপতির তালিকায়। গতকাল যার গলায় ঝুলেছিল সেনাপতির প্রতীক, পরদিন তার নাম চলে যেত সাধারণ সৈনিকের কাতারে। এভাবে চলতে থাকত নেতৃত্বের পালাবদল।

কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় এ ধারাটি অব্যাহত থাকেনি খুব বেশিদিন। শৌর্যবীর্য ও লড়াইয়ে প্রবল বীরত্বের অজুহাতে কোনো কোনো সেনাপতি কুক্ষিগত করে নিতেন বাহিনীর পতাকা। একের পর এক যুদ্ধ পরিচালিত হতো তার নেতৃত্বে। সৈনিকেরাও তার

দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার ধাঁধায় পড়ে প্রকাশ করতেন পরম আনুগত্য। তারা ভেবে নিতেন কেবল সেনাপতিই তাদের নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত ও কর্তৃত্বের অধিকারী। এভাবে একটি সময় এমন আসে—না চাইলেও তাদেরকে সেনাপতির আনুগত্য প্রকাশ করতে বাধ্য হতে হতো। এর পর সেই সেনাপতি যদি হয়ে থাকেন সিংহাসনের অভিলাষী—তাহলে তো কথাই নেই। অভিলাষী মন তাকে বোঝাতে থাকে—'এই তো সময় নিজের কর্তৃত্ব খাটানোর। এত বড় সেনাপতি তুমি, তোমার নামে একটি সাম্রাজ্য না থাকলে কী হয়!' কিছুদিন রাষ্ট্রের সঙ্গে টকঝালমিষ্টি লেনদেন করে অবশেষে বিদ্রোহ করে বসতেন সেই সেনাপতি। বিষয়টি ভালোভাবে অনুধাবনের জন্য নিম্নে উল্লিখিত ঘটনাগুলো বেশ প্রাসঙ্গিক।

খালিদ ইবনু ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু। জাহিলি যুগে তিনি ছিলেন অশ্বারোহী সেনাপতি। উহুদ ও হুদাইবিয়ার অভিযানে তার বীরত্বের কথা আমরা ইতিহাসের পাতায় পাতায় খুঁজে পাই। ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি হয়ে ওঠেন মুসলিমদের তুরুপের তাস। এক অনন্য অভিযাত্রী, মহানায়ক। মুতার যুদ্ধে তিনি সাধারণ সৈনিক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু একে একে তিনজন সেনাপতি—জায়িদ ইবনু হারিসা, জাফর ইবনু আবি তালিব, আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা—শহিদ হয়ে যাওয়ার পর সেনাপতির দায়িত্ব তার কাঁধে এসে বর্তায়। তিনিও সাদরে গ্রহণ করে নিলেন আমিরের মহান দায়িত্ব। তুমুল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়েন শত্রুর ওপরে। অমুসলিম বাহিনীর হাতে মার খেয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন মুসলিম বাহিনী। কিন্তু সেনাপতির ভার খালিদ ইবনু ওয়ালিদের কাছে আসতেই পালটে যায় যুদ্ধের মতিগতি। পরাজয়ের একেবারে কিনার হতে উদ্ধার করে পুরো বাহিনীকে পরিণত করেন শক্ত মানবপ্রাচীরে। তিনি নতুন করে ঢেলে সাজান পুরো জমায়েতকে। সম্মুখ ফ্রন্টকে পশ্চাতে এবং পশ্চাৎ ফ্রন্টকে সম্মুখে নিযুক্ত করেন। দূর থেকে মরুর বুকে ধূলিঝড় উঠিয়ে হামলা করে বসেন শত্রু শিবিরে। প্রবল হামলার সম্মুখীন হয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে শত্রুদল। ভাবে, এই তো মদিনা থেকে মুসলিমদের জন্য সাহায্যকারী বাহিনী এসে পৌঁছে গেছে। একপর্যায়ে তারা হতোদ্যম হয়ে রণেভঙ্গ দেয়।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময় খালিদ ইবনু ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু রিদ্দার যুদ্ধ, ইরাক বিজয়, সেখান থেকে সাহসিকতার সঙ্গে সামনে ফিরে আসা ও ইয়ারমুকের যুদ্ধে প্রবল বীর-বিক্রমতা প্রদর্শন করেন। এ সকল রণাঙ্গনে অপ্রতিরোধ্য বিজয়ের ফলে অধিকাংশ মুসলিমের মনে তার প্রতি আলাদা সমীহ দৃষ্টি তৈরি হয়। বিশেষ আনুগত্য জেগে ওঠে জনমানুষের অন্তরে। তার নেতৃত্বে যুদ্ধ করা, রণাঙ্গনে শরিক হওয়া বিশেষ কামনার বস্তুতে পরিণত হয়। এমনকি যুদ্ধের প্রতি যাদের অনীহা ছিল, তারাও খালিদ ইবনু ওয়ালিদকে দেখে মুজাহিদদের কাতারে এসে শরিক হতে লাগে। মানুষের মনে এই ধারণা গেড়ে বসে যে, খালিদ ইবনু ওয়ালিদকে কখনোই পরাজিত করা সম্ভব নয়।

প্রথম অধ্যায়

তুর্কি সেনাপতিদের কর্তৃত্বকাল

[১১]

আল-মুনতাসির বিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু জাফর আল-মুতাওয়াক্কিল

[২৪৭-২৪৮ হি.]

মুহাম্মদ আল-মুনতাসির ইবনু জাফর ২২২ হিজরিতে মোতাবেক ৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দে ইরাকের সামাররায় জন্মগ্রহণ করেন। তার মা ছিলেন একজন রোমান ক্রীতদাসী। তাকে হাবশিয়া নামে ডাকা হতো। মুনতাসিরের উপনাম আবু জাফর, মতান্তরে আবু আবদুল্লাহ।

তিনি ছিলেন লাবণ্যময় চেহারার অধিকারী, তাম্রবর্ণ, ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট, মধ্যম উচ্চতার, বিশালদেহী, বুদ্ধিদীপ্ত, প্রভাবশালী এবং কল্যাণকর কাজে আগ্রহী একজন শাসক। তিনি মাঝেমধ্যে অন্যায় করতেন তবে তা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর বংশধর আলাবিদের বিশেষ কল্যাণকামী হিসেবে সুবিদিত ছিলেন। তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতেন। এমনকি আগ্রহের আতিশয্যে একজন আলাবিকে মদিনার শাসনকর্তা হিসেবেও নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর বংশধরের ওপর থেকে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাজার জিয়ারতের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন। হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর বংশধরকে ফাদাকের ভূখণ্ডটি ফিরিয়ে দেন।[৬]

পিতার হত্যাকাণ্ডের পর ২৪৭ হিজরির ৪ শাওয়াল তাকে খিলাফতের বাইআত প্রদান করা হয়। দায়িত্ব গ্রহণের অব্যবহিত পরেই তিনি ফাতাহ ইবনু খাকানকে নিজের পিতৃহত্যার জন্য দায়ী করেন এবং প্রতিশোধস্বরূপ তাকে হত্যা করেন।[৭] খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে মুনতাসির তুর্কি সেনাপতিদের পছন্দ করতেন। কিন্তু দায়িত্ব গ্রহণ

[৬] *তারিখুল খুলাফা,* পৃষ্ঠা : ২৫৯-২৬০।

[৭] *তারিখুত তাবারি,* খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ২৩৪, দারুত তুরাস।–নিরীক্ষক

করার পর তিনি তাদেরকে গালমন্দ করতে শুরু করেন। এবং তুর্কিদের তিনি 'খলিফা হত্যাকারী' বলে আখ্যায়িত করেন।

উজির আহমদ ইবনু খাসিব এবং ওয়াসিফ ও বুগা নামের দুই তুর্কি সেনাপতি মুনতাসিরকে বারবার উৎসাহিত করতে থাকেন—যেন তিনি স্বীয় দুই ভ্রাতৃদ্বয় মুতাজ ও মুআইয়াদকে অপসারণ করে নিজের ছেলে আবদুল ওয়াহাবকে পরবর্তী খলিফা হিসেবে মনোনীত করেন। এ নিয়ে তারা উপর্যুপরি পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। একপর্যায়ে খলিফা তাদের কথায় সম্মত হলেন। মুআইয়াদ অনেকটা ভয়ে অতি সহজে এই সিদ্ধান্ত মেনে নিলেও মুতাজ তা মানতে অস্বীকার করেন। তাকে সকলের সামনে ধরে এনে লাঞ্ছিত করা হলো। মুআইয়াদ বুঝিয়ে-শুনিয়ে তাকে খিলাফতের মসনদে নিজের উত্তরাধিকার ছেড়ে দিতে সম্মত করলেন।[৮] কিন্তু কিছুদিন পর মুআইয়াদকে নিজের বিছানায় নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়। অভিযোগ রয়েছে, তার দাসই তাকে হত্যা করেছে। কিন্তু অন্য বর্ণনা বলছে, সে সময় তার মৃত্যু ঘটেনি। বরং তিনি জীবিত ছিলেন। পরবর্তীকালে আপন ভাই মুতাজ যখন অল্প সময়ের জন্য সিংহাসনে বসেন, তখন মুআইয়াদকে খিলাফতের উত্তরাধিকার থেকে বিচ্যুত করা হয়। এরপর তাকে বেদম প্রহার করা হয়। এতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

উজির আহমদ ইবনু খাসিবের চক্রান্তে তুর্কি সেনাপতি ওয়াসিফকে মালাতিয়া হয়ে রোমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। খলিফা মুনতাসির ওয়াসিফকে নির্দেশ দেন যেন তিনি কমপক্ষে চার বছর সীমান্তে অবস্থান করবেন এবং যখনই রোমানরা হামলা করবে, তিনি যেন তা প্রতিহত করেন।[৯]

এদিকে মুহাম্মদ ইবনু আমর আল-জাজিরার মসুল অঞ্চলে বিদ্রোহ করে বসেন। তাকে দমন করার জন্য সেনাপতি ইসহাক ইবনু সাবিতকে প্রেরণ করা হলো। ইসহাক তাকে আরো কিছু সঙ্গীসাথিসহ আটক করে খলিফার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে সবাইকে হত্যা করা হয়।

মুনতাসিরের নসিবে খিলাফতের মসনদ বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। রবিউস সানি মাসের এক বৃহস্পতিবার তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার খিলাফতের সময়কাল ছিল মাত্র ছয় মাস। মৃত্যুর কারণ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, ২৫ রবিউল আউয়াল তিনি শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত হন। ১০ দিন অসুস্থ থাকার পর তার মৃত্যু ঘটে। অনেকে বলেছেন,

[৮] *তারিখুত তাবারি*, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ২৩৭, দারুত তুরাস।–নিরীক্ষক
[৯] প্রাগুক্ত, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ২৪০, দারুত তুরাস।–নিরীক্ষক

তাকে নাশপাতির মধ্যে বিষপ্রয়োগ করে মারা হয়েছিল। কারো কারো মতে, তাকে অস্ত্রোপচারের ছুরি দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল।[১০]

মুনতাসিরের পর তার চাচাতো ভাই মুসতাইনের জন্য খিলাফতের বাইআত গ্রহণ করা হয়।

বিচ্ছিন্ন সাম্রাজ্যসমূহ

তখন বিভিন্ন অঞ্চলে যেসব রাজত্ব ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল, আব্বাসিদের প্রথম আমলে তাতে তাদের মাঝে কোনো ধরনের ভিন্নতা বা বিরোধাভাস পরিলক্ষিত হয়নি। বলতে গেলে সবগুলো সাম্রাজ্য মাগরিব অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। আর পূর্বদিকে তাহিরিদের যে রাজত্ব, তাকে আমরা পৃথক কোনো রাষ্ট্র বলতে পারি না। কেননা তারা কখনোই আব্বাসিদের বিরুদ্ধে মাঠে-ময়দানে নেমে আসেননি। বরং খলিফার সম্মতিক্রমেই সেখানে সব সময় শাসনকর্তা নিয়োগ করা হতো। যদিও সমস্ত শাসকই নির্বাচিত হতো তাহির ইবনু হুসাইনের বংশধর থেকে।

আর সাফফারি জনগোষ্ঠীর যে রাজত্ব, তা কখনোই আব্বাসি খলিফাদের বিরুদ্ধে আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেনি। যদিও এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ইয়াকুব ইবনু লাইস আস-সাফফার নিজের রাজত্বের বিস্তার ঘটাতে শুরু করেছিলেন। এমনকি সিজিস্তান থেকে হিরাত পর্যন্ত যুদ্ধযাত্রা করে পুরোটা অঞ্চল তিনি নিজের রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন।

এদিকে ২৩৮ হিজরি থেকে স্পেনের (আন্দালুসিয়া) ক্ষমতা ছিল মুহাম্মদ ইবনু আবদির রহমান সানির হাতে। এ সময় মুসলিমরা বার্সেলোনার উদ্দেশে যুদ্ধযাত্রা করেন। তারা শহরটির উপশহরগুলো জয় করে নিতে সক্ষম হন। এমনকি বার্সেলোনার দুটি দুর্গও দখল করে নিয়েছিলেন। কিন্তু ফিরে আসার পর সেগুলো আর তাদের দখলে থাকেনি, পুনরায় খ্রিষ্টানদের হাতে চলে যায়।

সে সময় ইদরিসিয়া সাম্রাজ্য বড় দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মধ্যে অতিক্রম করছিল। কখনো তারা রিফের শাসনকর্তা আলি ইবনু উমর ইবনু ইদরিসের আনুগত্য করতেন, আবার কখনো কাসিম ইবনু ইদরিসের আনুগত্যে চলে যেতেন। এরই মধ্যে আবার আবদুর রাজ্জাক ফাহরি নামে সুফরিয়া খারিজিদের এক নেতা বিদ্রোহ করে আলি ইবনু উমর ইবনু ইদরিসকে ইউরোপে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেন। কিন্তু ফেজের অধিবাসীরা তার ভাতিজা ইয়াহইয়া ইবনু ইদরিস ইবনু উমর ইবনু ইদরিসকে ডেকে আনেন এবং তার হাতে

[১০] *তারিখুত তাবারি,* খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ২৫১, দারুত তুরাস।–নিরীক্ষক